জন্ম যদি তব বঙ্গে

ঃ সুবোধ চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাবিভাগ প্রবর্তিত নূতন পাঠ্য-সূচী অনুসারে
পঞ্চম শ্রেণীর সহ-পাঠ্য।

জন্ম যদি তব বঙ্গে

[পঞ্চম শ্রেণীর জন্য]

ডঃ সুবোধ চৌধুরী

অধ্যক্ষ, হেরম্বচন্দ্র কলেজ, কলিকাতা-১৯

BBS

ভারতী বুক স্টল
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট; কলিকাতা-৯
ফোন ৩৪-৫১৭৮ • পিন ৭০০০০৯

প্রকাশক :
শ্রীঅশোককুমার বারিক
ভারতী বুক স্টল
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

চতুর্থ সংস্করণ—স্বাধীনতা দিবস, ১৯৮৫

মূল্য—ছয় টাকা মাত্র।

মুদ্রাকর :
শুভেন্দু রায়
উষা প্রেস
৩২এ, শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলিকাতা-৪

নিবেদন

আমাদের ছেলেবেলায় বিদ্যালয়গুলিতে দেখতাম, দিনের কাজ আরম্ভ হওয়ার আগে প্রত্যহ প্রার্থনা-সঙ্গীত গাওয়া হ'ত। পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকত ধর্মশিক্ষা জাতীয় বই। আজকাল সে সব উঠে গেছে। ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে, সে বিচার করতে চাইনে। তবে শিশুদের যে বয়সে জীবনের মোড় ফেরার সময়, অন্ততঃ সেই সময়ে নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে কিছু কিছু আদর্শ গল্প বা মহাপুরুষের জীবনী তাদের সামনে তুলে ধরলে, তাদের জীবনে সেগুলির ছাপ পড়বে। এই আশায় বর্তমান গ্রন্থটিতে পুরাণের গল্প, লৌকিক কাব্য-কাহিনী এবং অবতারের জীবন-চরিত প্রভৃতির মধ্য দিয়ে আদর্শের কথা সহজভাবে শিশুদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

পুরাণের কাহিনীকে বাঙালী তাঁদের নিজের মত করে গড়ে নিয়েছে; তেমনি তৈরি করে নিয়েছেন অন্যান্য ধর্ম-কাহিনীকে তাঁর ভক্তির মানস-পটে। বাঙালী ছাত্র-মাত্রেরই এগুলির সঙ্গে যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া আবশ্যক। এ-কথা মনে রেখে বইটির নাম দেওয়া হয়েছে 'জন্ম যদি তব বঙ্গে'।

যাদের জন্য এ বইটি লেখা, তাদের বইটি ভাল লাগলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব। পরিশেষে বেদের শান্তিবচন স্মরণ করি—

ওঁ সহ নবাবতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহবীর্য্যং করবাবহৈ।
তেজস্বিনাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ঈশ্বর আমাদের (আচার্য ও শিষ্যকে) সমভাবে রক্ষা করুন। আমাদের উভয়কে অধীত বিদ্যার ফলভোগে সমর্থ করুন। আমরা যেন ওজস্বী হই; যেন অধীত বিদ্যা আমাদের জীবনে কার্যকরী হয়। আমরা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের ভাব যেন পোষণ না করি। ওঁ শান্তি—শান্তি—শান্তি।

রাসপূর্ণিমা
১৯৮১

নিবেদক
গ্রন্থকার

সূচীপত্র



দস্যু রত্নাকর

পুরাকালে চ্যবন নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁর পুত্র রত্নাকর। দস্যুবৃত্তি করে সে তার সংসার চালাত—এতে রত্নাকর খুব আনন্দ পেত। তাকে সবাই দস্যু রত্নাকর বলে ডাকত।

একদিন ব্রহ্মা ও নারদমুনি ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দস্যু রত্নাকর গাছের ওপর থেকে দেখতে পেল, দুজন পথিক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। সে মনে মনে ভাবল, নিশ্চয়ই এদের কাছে অনেক টাকা-কড়ি আছে। দস্যু রত্নাকর লাঠি দিয়ে তাঁদের মারবার জন্য এগিয়ে গেল। ব্রহ্মা ও নারদমুনি দুজনে প্রাণভয়ে চীৎকার করে বললেন, আমাদের কাছে তো কোন মূল্যবান জিনিষ নেই, তবে মিছেমিছি কেন আমাদের মারবে ?

রত্নাকর অট্টহাসি হেসে বলল, কিছু তাদের কাছে থাক আর না থাক, মানুষ মেরেই তার আনন্দ। ব্রহ্মা তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মানুষ মারাটাই তো বড় কথা নয় ; কিন্তু এ সব মানুষ মেরে তোমার যে পাপ হয়, সে পাপের ভাগী কে হবে ?

পাপের কথা শুনে রত্নাকর হেসে উত্তর দিলে—কেন, দস্যুবৃত্তি করে, সে যাদের খাওয়ায় ও পরায়, তারাই আমার পাপের ভাগী হবে ; এ আর নতুন কথা কি ?

নারদ তাকে বোঝালেন—তা কি করে হয়! অন্যায় যে করে, সে নিজেই নিজের পাপের বোঝা বয়। অন্য লোক পাপের ভাগ কেন নিতে যাবে? রত্নাকর মনেমনে ভাবল, তা হবে কেন? সে যখন সকলকে প্রতিপালন করে, তখন তারা সবাই নিশ্চয় তার পাপের ভাগ নেবে।

ব্রহ্মা ও নারদ দুজনেই বললেন, আচ্ছা তুমি তোমার পরিজনবর্গকে জিজ্ঞাসা করে এসো—তাঁরা কেউ তোমার পাপের ভাগী হ'তে রাজী হবেন কি-না!

রত্নাকর তখন মনে মনে ভাবল—এ দুজন এসব কথা বলছে, বুঝি পালাবার ফন্দিতে। সে আবার ভাবল, এরা যে কথা বলছে, তা একবার বাড়ীর লোকজনদের জিজ্ঞাসা করে এলে মন্দ হয় না। শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মা ও নারদকে একটা মোটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে এমন শক্ত করে বাঁধল, যাতে তারা কোনমতেই পালাতে না পারে। তারপর বাড়ী গিয়ে সে প্রথমে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করল—বাবা, আমি ডাকাতি করে, মানুষ মেরে যা রোজগার-পত্র করি, তাতে নাকি আমার পাপ হয়। এতে যদি সত্যিই পাপ হয়, তবে সে পাপের ভাগ তুমি নেবে তো!

ছেলের কথা শুনে চ্যবন ঋষি তো অবাক্; তিনি বললেন, কে তোমাকে বলেছে এই পাপের পথে আমাদের ভরণ-পোষণ করতে? এসব পাপের ভাগ আমি নিতে যাব কেন? রত্নাকর তখন বিক্ষিপ্ত মনে মায়ের কাছেও ঐ একই প্রশ্ন করল। রত্নাকরের প্রশ্ন শুনে মা তো কেঁদেই আকুল।

মা বললেন, বাবা! তুই এসব কাজ আর করিস্ না। এসব পাপ-কাজের দরকার কি? আমরা না হয় উপোস করেই থাকব। তবু এসব অন্যায় কাজ আমরা সহ্য করতে পারছি না। এক জনের পাপের ভাগ কি অন্য জন কেউ কখনো নেয়?

মায়ের কথা শুনে রত্নাকরের মনটা খুবই দমে গেল। সে তখন তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে ঐ একই কথা জিজ্ঞাসা করল।

স্ত্রী বলল, সে কি কথা! আমায় যখন তুমি বিয়ে করেছ, তখন সব দায়িত্বই তোমার। তোমার পাপের ভাগ আমি কেন নিতে যাব?

এদের সকলের কথা শুনে রত্নাকরের মনে খুব কষ্ট হল। বিমর্ষ হয়ে সে ফিরে এল ঐ দু জন ব্রাহ্মণের কাছে। রত্নাকরের চোখে জল, মনে উদাস ভাব। নিজের প্রতি তার খুব ধিক্কার এল। সে মনে মনে ভাবল, এতদিন তো সে বহু ডাকাতি করেছে ; বহু নিরীহ মানুষকেও সে মেরেছে। তার পাপের বোঝা অনেক বেড়ে গেছে, অথচ তার পাপের ভাগ নেবার তো কেউ নেই। তাহ'লে এতদিন ধরে সে এত পাপ কেন করল ?

রত্নাকর ফিরে এসে দু জন পথিককে মুক্ত করে দিলে। তারপর সে পথিক দুজনের পা জড়িয়ে আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল—এখন কি উপায় হবে ? কেউ তো তার পাপের ভাগ নেবে না। এ পাপের বোঝা থেকে তার কি উদ্ধার পাবার কোনই উপায় নেই ?

পথিকবেশী ব্রহ্মা তখন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, একমাত্র এর উপায়—ভক্তিভরে ভগবানের নাম করা। রাম নাম করলে তার পাপের বোঝা কমে যাবে।

কিন্তু রত্নাকরের মুখে রাম নাম উচ্চারণই হয় না। পাপ করে তার জিহ্বায় জড়তা এসে গেছে। ব্রহ্মা দেখলেন—এ তো ভারী মুস্কিল। কি করে ওর মুখ দিয়ে রাম নাম উচ্চারণ করানো যায়। তখন ব্রহ্মা একটা মরা গাছের ডাল দেখিয়ে রত্নাকরকে বললেন—বল তো, ওটা কেমন ডাল ?

রত্নাকর উত্তর দিল—মরা। ব্রহ্মা বারবার এই একই কথা তাকে উচ্চারণ করে যেতে বললেন। বার বার মরা মরা উচ্চারণ করাতে রত্নাকরের মুখে রাম রাম এসে গেল। তখন তাঁরা দুজন বললেন—যতক্ষণ না আমরা ফের ফিরে আসি, তুমি ততক্ষণ এই রাম নাম জপ করে যাও।

"মরা মরা বলিতে আইল রাম নাম।
পাইল সকল পাপে মুনি পরিত্রাণ॥

রত্নাকর সেখানে বসে কেবলই রাম নাম জপ করতে লাগল। অনেক —অনেক বছর ধরে চলল সেই রাম নাম জপ। রত্নাকর রাম নাম জপ ছাড়া আর কিছুই জানে না। রাম নাম জপ করতে করতে শেষ পর্যন্ত বল্মীকের ঢিপিতে তার দেহের সবটাই ঢেকে গেল। তবু কোন দিকেই তার লক্ষ্য নেই—শুধু লক্ষ্য—রাম নাম জপ। অবিরাম শুধু রাম নাম জপ।

দীর্ঘকাল পরে ব্রহ্মা ও নারদ আবার সেখানে এলেন। রত্নাকরের রাম নামে নিষ্ঠা দেখে, তাকে দুজনে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। তাঁরা বল্মীকের স্তূপের (অর্থাৎ উই-এর ঢিপির) ভেতর থেকে তাকে বের করে আনলেন।

তাঁর নতুন নাম হ'ল বাল্মীকি।

ব্রহ্মা ও নারদের কৃপায় দস্যু রত্নাকর হলেন বাল্মীকি মুনি। এবার তাঁরা বাল্মীকিকে রামায়ণ রচনা করতে আদেশ দিলেন। রামায়ণে থাকবে শ্রীরামচন্দ্রের জীবন-কথা, রামের মাহাত্ম্য-বর্ণনা। তাঁর রচিত রামায়ণ পাঠ করে মানুষ যেন ধন্য হন। তাঁর রামায়ণ গান শুনে মানুষের সব পাপ যেন ধুয়ে মুছে যায়।

এভাবেই রচিত হ'ল—পৃথিবীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ—রামায়ণ।

"জয় জয় রঘুপতি রাঘব রাজা রাম
পতিত পাবন সীতা রাম।"

———

ভগীরথের গঙ্গাআনয়ন



সূর্যবংশে সগর নামে এক রাজা ছিলেন। সগর রাজা দুই পত্নী এবং ষাট হাজার ছেলে নিয়ে সুখে রাজত্ব করেন। তিনি একবার অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন। সেকালে রাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করে সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি বলে পরিগণিত হতেন।

অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য সুবিশাল যজ্ঞশালা প্রস্তুত হল—আয়োজনও হল বিরাট। দেবতার নামে উৎসর্গ করে যজ্ঞের অশ্ব ছেড়ে দেওয়া হল পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে। দেবরাজ ইন্দ্র প্রথম থেকেই বাধ সাধলেন—কিছুতেই তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করতে দেবেন না। গোপনে তিনি সেই যজ্ঞের অশ্ব বেঁধে রাখলেন কপিল মুনির আশ্রমে। কপিল মুনি তখন ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানতে পারলেন না।

এদিকে সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল জুড়ে সেই যজ্ঞাশ্ব অন্বেষণ শুরু করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত সেই অশ্ব খুঁজে পাওয়া গেল পাতালে কপিল মুনির আশ্রমে। পাতালে খুঁজতে গিয়ে তাঁরা সেখানে অশ্ব পেলেন। সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র কপিল মুনিকে দোষী সাব্যস্ত করে, তাঁর ওপর উৎপীড়ন আরম্ভ করলেন। মুনির ধ্যানভঙ্গ হলো।

কপিল মুনি রেগে চোখ মেলে তাঁদের দিকে তাকালেন। তাঁর রোষানলে ভস্মীভূত হল সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র। যজ্ঞাশ্ব সেই আশ্রমেই বাঁধা রইল।

বহুকাল পরে সগর রাজার এক বংশধর অংশুমান পাতালে গিয়ে সব বৃত্তান্ত শুনলেন। তিনি কপিল মুনির ধ্যান করে তাঁকে সন্তুষ্ট করলেন। তাঁর কাছ থেকেই জানতে পারলেন, তাঁর পূর্বপুরুষ সগর রাজার ষাট হাজার পুত্রের জীবন ফিরে পাওয়ার উপায়। গঙ্গাকে যদি স্বর্গলোক থেকে মর্ত্যলোকে আনা যায়, তবে সেই পবিত্র গঙ্গাজলে অভিশাপ খণ্ডন হয়ে, সগর রাজার সন্তানদের শাপ মোচন হবে এবং তাঁরা পুনরায় তাঁদের জীবন ফিরে পাবেন।

ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে আছেন সুরধনী গঙ্গা—তপস্যায় সন্তুষ্ট করে তাঁকে মর্ত্যলোকে আনতে হবে। শেষ পর্যন্ত একাজের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এলেন, সগর রাজার আর এক বংশধর—ভগীরথ।

ভগীরথ মর্ত্যলোকে সুরধনী গঙ্গাকে আনবেন—এই সংকল্প নিয়ে তিনি এগিয়ে চললেন। সর্বপ্রথমে তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের তপস্যা আরম্ভ করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ভগীরথের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে, তাঁকে পরামর্শ দিলেন, দেবাদিদেব মহাদেবকে তুষ্ট করতে। ধ্যানে ভগীরথ মহাদেবকে তুষ্ট করলেন। মহাদেব তাঁকে পরামর্শ দিলেন, ভগবান বিষ্ণুর তপস্যা করতে। ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু তাঁকে নিয়ে গেলেন ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা বহুদিন পর বিষ্ণুকে দেখে আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং বিষ্ণুর পায়ে তাঁর কমণ্ডলুর সুরধনী-ধারা ঢেলে দিলেন। কমণ্ডলু থেকে বেরিয়ে এলেন গঙ্গা—তাঁর অনন্ত বারিপ্রবাহ নিয়ে।

তখন বিষ্ণু সেই সুরধনী-ধারা নিয়ে মর্ত্যে যাবার জন্য ভগীরথকে আদেশ দিলেন। এতকাল পরে ভগীরথের অভীষ্ট পূর্ণ হতে চলেছে; মর্ত্যে গঙ্গা এলে তাঁর ষাট হাজার পিতৃপুরুষের আত্মার সদ্‌গতি হবে। ভগীরথ পরম ভক্তিভরে শাঁখ বাজিয়ে এগিয়ে চলেছেন—পতিত-পাবনী সুরধনী গঙ্গাকে নিয়ে।

ভগীরথ আগে পথ দেখিয়ে চলেছেন। গঙ্গা তাঁর বিপুল জলরাশি নিয়ে চলেছেন ভগীরথের পিছন পিছন। কিছুদূর এসে সুমেরু পর্বতের কাছে ভগীরথ দেখেন, গঙ্গা তাঁর পিছনে নেই। পাহাড়ের গুহায় গঙ্গা পথ হারিয়ে ফেলেছেন ; বেরুবার পথ আর খুঁজে পাচ্ছেন না। ভগীরথের কাতর প্রার্থনায় দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর ঐরাবত পাঠিয়ে দিলেন। সেই ঐরাবত তার বিশাল দাঁত দিয়ে সুমেরু পর্বত চৌচির করে দেবার পর গঙ্গা মুক্ত হলেন।

গঙ্গা এখান থেকে চারটি ধারায় প্রবাহিত হয়ে কৈলাসে এসে উপস্থিত হলেন। এখন গঙ্গার প্রচণ্ড বেগ। সে বেগ ধারণ করার ক্ষমতা মর্ত্যের কারও নেই। তাই, মহাদেব তাঁর জটায় গঙ্গার সেই বেগ সংবরণ করলেন। এবার সুরধনী গঙ্গা মহাদেবের জটার জালে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন। আবার সুরু হল ভগীরথের সাধনা। ভগীরথের সাধনায় মহাদেব আপন জটা থেকে গঙ্গাকে মুক্তি দিলেন। মহাদেবের জটা থেকে গঙ্গা হরিদ্বারে এসে মুক্তি পেলেন। হরিদ্বার থেকে পতিত-পাবনী গঙ্গা নেমে এলেন সমতল ক্ষেত্রে, প্রয়াগের ত্রিবেণী-সঙ্গমে।

বারাণসী সংলগ্ন হয়ে গঙ্গা এগিয়ে চললেন পূর্বদিকে ভগীরথের শঙ্খধ্বনি শুনতে শুনতে। ভগীরথের শঙ্খধ্বনি বেজেই চলেছে—আর সেই সঙ্গে এগিয়ে চলেছে গঙ্গার জল-তরঙ্গ। দেবতারা আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করছেন।

পথে আবার এক বিপদ এসে দেখা দিল। গঙ্গার জল-তরঙ্গে জহ্নুমুনির আশ্রম ভেসে গেল। এজন্য জহ্নুমুনি খুব রেগে গেলেন। তিনি এক গণ্ডুষে গঙ্গার সব জল পান করে ফেললেন। শেষ পর্যন্ত ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হয়ে জহ্নুমুনি তাঁর ক্রোধ সংবরণ করলেন এবং তাঁর দক্ষিণ জানু ভেদ করে গঙ্গাকে বার করে দিলেন। জহ্নুমুনির জানু ভেদ করে গঙ্গা বের হয়েছেন। তাই গঙ্গার অপর নাম জাহ্নবী।

আর কোন বাধা নেই—ভগীরথ এগিয়ে চলেছেন পরম ভক্তিভরে—শাঁখ বাজিয়ে। গঙ্গা এবার চলেছেন মকর-বাহিনী হয়ে সমুদ্র অভিমুখে। সাগর-সঙ্গমে কপিল মুনির আশ্রম, সুরধনী সেখানে উপস্থিত হলেন।

কপিল মুনির আশ্রমে গঙ্গার স্পর্শ পেয়ে সগর রাজার ষাট হাজার ছেলের হল শাপ মোচন। তাঁরা তাঁদের আগেকার জীবন ফিরে পেলেন। পতিত-পাবনী গঙ্গার পবিত্র স্পর্শে মর্ত্যভূমি হয়ে উঠল শস্যশ্যামলা— মর্ত্যের পাপী-তাপী আর সব মানুষের প্রাণে ফিরে এল পবিত্রতার সঞ্জীবনী মন্ত্র। আজও আমাদের দেশের অসংখ্য মানুষ কপিল মুনির আশ্রমের কাছে সাগর-সঙ্গমে মকর সংক্রান্তির দিন স্নান করে অক্ষয় পুণ্য অর্জন করেন। পৌষ সংক্রান্তির দিন সাগর-সঙ্গমে স্নান করে ধন্য হন মর্ত্যের মানুষরা।

জয় জয় দেবী সুরেশ্বরী গঙ্গে।
পতিত-পাবনী জলধি তরঙ্গে ॥

———



ভক্ত প্রহ্লাদ

পুরাকালে হিরণ্যকশিপু নামে এক দৈত্য ছিলেন। তাঁর বড় ছেলের নাম ছিল হিরণ্যাক্ষ। হিরণ্যাক্ষের অকথ্য অত্যাচারে পৃথিবী জর্জরিত হলে ভগবান বরাহ-অবতারে তাঁকে বধ করে ধরিত্রীতে শান্তি ফিরিয়ে আনেন।

হিরণ্যাক্ষ মারা যাবার পর, তাঁর ভাই হিরণ্যকশিপু সেই প্রতিশোধ নেবার জন্য সচেষ্ট হলেন। অমর হবার জন্য প্রথমে তিনি মন্দার পর্বতে কঠিন তপস্যা সুরু করেন। হিরণ্যকশিপুর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাঁকে নিজ ইচ্ছামত বর দিলেন—কোন মানব কিংবা কোন দেবতা, ঘরে কিংবা বাইরে, দিনে অথবা রাতে, মাটিতে কিংবা শূন্যে হিরণ্যকশিপুকে বধ করতে পারবেন না।

ব্রহ্মার বলে বলীয়ান হ'য়ে হিরণ্যকশিপু সব দেবতা ও মানুষের ওপর অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করলেন। এমন কি শেষ পর্যন্ত স্বর্গলোক আক্রমণ করে নন্দন-কানন ও ইন্দ্রের রাজপুরী বৈজয়ন্তধাম জয় করে নিলেন। হিরণ্যকশিপু আগে থেকেই ছিলেন বিষ্ণু-বিদ্বেষী। তাই দেবতারা প্রাণ-ভয়ে ভীত হয়ে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন।

দেবতাদের প্রার্থনা শুনে বিষ্ণু তাঁদের আশ্বাস দিলেন, অচিরেই দৈত্য হিরণ্যকশিপুর পতন হবে।

হিরণ্যকশিপুর চার ছেলের মধ্যে একজন প্রহ্লাদ। জন্মকাল থেকেই ছিলেন প্রহ্লাদ বিষ্ণু-ভক্ত। তাঁর বিদ্যা-রূপ-গুণ সবই ছিল; কিন্তু তাঁর মনে কোনও অহঙ্কার বা অভিমান ছিল না।

দৈত্যপুরীতে এরূপ ব্যতিক্রম দেখে, স্বয়ং হিরণ্যকশিপুও অবাক হলেন। পুত্র প্রহ্লাদের জন্য তিনি সর্বদা চিন্তিত। প্রহ্লাদ সব সময় বিষ্ণুর নামে মগ্ন থাকতেন। রাজপুরীর ঐশ্বর্য, বিলাস, আমোদ, আহ্লাদ কিছুই তাঁর ভাল লাগে না। হিরণ্যকশিপু পুত্রের এই মতিগতি পরিবর্তন করবার জন্যে, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রহ্লাদের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করলেন। দৈত্যগুরুর দুই পুত্র ষণ্ড ও অমর্ক প্রহ্লাদকে শিক্ষাদান করবার জন্য নিযুক্ত হলেন।

প্রহ্লাদের ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন কিছুই ভাল লাগে না। হিরণ্যকশিপু এসব সংবাদ শুনে প্রহ্লাদের প্রতি রীতিমত রুষ্ট হলেন। তিনি নিজে বিষ্ণুদ্বেষী—আর তাঁর পুত্র হবে কিনা বিষ্ণুভক্ত; এ কিছুতেই হতে পারে না। যেমন করেই হোক্, প্রহ্লাদের এ মতিগতি পরিবর্তন করাতেই হবে।

দিন যায়, আবার দিন আসে। কিন্তু প্রহ্লাদের কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। হিরণ্যকশিপু নিজেও পুত্রকে অনেক বোঝালেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হ'ল না। এবার হিরণ্যকশিপু রুষ্ট হয়ে প্রহ্লাদের প্রাণনাশ করতে কৃতসংকল্প হলেন। পিতৃদ্রোহী পুত্রের মৃত্যুই হিরণ্যকশিপুর একমাত্র কাম্য।

হিরণ্যকশিপুর কঠোর আদেশে দৈত্যরা প্রহ্লাদকে শূলে চাপালেন। প্রহ্লাদ হাসিমুখে বিষ্ণুর নাম জপ করতে লাগলেন। শূলের আঘাত হল ব্যর্থ। প্রহ্লাদকে এবার একটা পাগলা হাতির সামনে ফেলে দেওয়া হল। সেই হাতি কিন্তু প্রহ্লাদের কোন ক্ষতি করল না। বরং তাঁকে শুঁড়ে করে তুলে নিলে। সকলেই এদৃশ্য দেখে অবাক! এবার প্রহ্লাদের হাত-পা বেঁধে বিষধর সাপের সঙ্গে একত্রে রাখা হল। সাপও তাঁর কোন ক্ষতি করল না।

প্রহ্লাদের ওপর যত অত্যাচার চলছে, ততই তিনি বিষ্ণুর নাম জপ করছেন। হিরণ্যকশিপু এসব দেখে আরও বেশী রেগে গেলেন।

এবার তাঁকে ফেলে দেওয়া হল, এক উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে। কিন্তু এতেও তাঁর কিছু হল না। পুড়িয়ে মারবার জন্য আগুনের মধ্যে তাঁকে ফেলে দেওয়া হল, কিন্তু ভক্তের সুকুমার দেহে আগুনের আঁচ লাগল না ; বরং আগুন নিভে গেল। তাঁর খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হল—কিন্তু তাতেও কিছু হল না। তাঁর জীবন-নাশের সব পন্থাই এমনিভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল। ভক্ত প্রহ্লাদের মুখে অবিরাম বিষ্ণুর নাম।

এবার হিরণ্যকশিপু আরও রেগে নিজেই তাঁর ছেলেকে মেরে ফেলার জন্য এগিয়ে এলেন। কর্কশকণ্ঠে তিনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন—কার বলে বলীয়ান হয়ে তুইআমাকে অমান্য করছিস্। আমার চেয়ে এ পৃথিবীতে বড় আর কে আছে ? যদি কেউ আমার চেয়ে বড় হয়, সে থাকেই বা কোথায় ? নির্ভীককণ্ঠে প্রহ্লাদ উত্তর দেন—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চেয়ে বড় আর কেউ নেই। তিনি সর্বত্রই আছেন। রোষে হিরণ্যকশিপু সামনের একটা থাম দেখিয়ে প্রশ্ন করেন—তোর বিষ্ণু কি এই থামের ভেতরও আছে ? প্রহ্লাদ পূর্ণ বিশ্বাসে উত্তর দেন—হ্যাঁ বাবা, তিনি এতেও আছেন। হিরণ্যকশিপু তখন রাগে দিশেহারা। রাগে থামে পদাঘাত করতে করতে চীৎকার করে বললেন—দেখি, তোর বিষ্ণু কত শক্তি ধরে।

সেই থামের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক ভয়ঙ্কর মূর্তি। এ মূর্তি মানুষের নয়, দেবতার নয়, পশুরও নয়—বিচিত্র এক মূর্তি—নৃসিংহ-মূর্তি। সভাকক্ষের দ্বারপ্রান্তে নিজের উরুর ওপর হিরণ্যকশিপুকে তুলে নিয়ে, নৃসিংহ তাঁর তীক্ষ্ণ নখর দিয়ে হিরণ্যকশিপুর বক্ষস্থল বিদীর্ণ করে দিলেন। হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু হল। হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু-সংবাদে স্বর্গের দেবতারা নিশ্চিন্ত হলেন। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ নৃসিংহ অবতারের স্তব করতে লাগলেন।

ভক্ত প্রহ্লাদ সেই ভয়ঙ্কর-দর্শন নৃসিংহ-মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে করজোড়ে শ্রীবিষ্ণুর স্তুতি করতে লাগলেন। নৃসিংহ-মূর্তির মুখে ফুটে উঠল এক হাসির রেখা—তিনি ভক্ত প্রহ্লাদকে বর দিতে চাইলেন।

প্রহ্লাদ অন্য কোন বর চান না—তিনি চাইলেন শুধু বিষ্ণুর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা-ভক্তি যেন আজীবন অটুট থাকে। নৃসিংহ-মূর্তি প্রীতিভরে প্রহ্লাদকে সেই বরই দিলেন। আর অভয় দিয়ে বললেন—তোমারই পুণ্যে তোমার পিতৃ-পুরুষ মুক্ত হবে। বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি রেখে আর দীর্ঘকাল সন্তানের মতো প্রজাপালন ও রাজ্যপালন করে তুমি বিষ্ণুলোকে যাবে। বর দিয়ে নৃসিংহ-মূর্তি অন্তর্হিত হলেন।

ভক্ত প্রহ্লাদ শান্তিতে বহু দিন রাজ্যপালন করে বিষ্ণুলোকে চলে গেলেন। ত্রিভুবনে ভক্ত প্রহ্লাদ চিরকাল অমর হয়ে রইলেন।

তব করকমলে—হিরণ্যকশিপু দলে
কেশরধৃত নরসিংহ রূপ, জয় জগদীশ হরে।

———



দানবীর রাজা হরিশ্চন্দ্র

সূর্যবংশে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের জন্ম। রূপে-গুণে, শৌর্যে-বীর্যে তিনি ছিলেন অসাধারণ। প্রজাপালক ও দানবীর হিসেবেও স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে তাঁর সমতুল্য কেউ ছিলেন না। দেবতাদের আশীর্বাদ নিয়ে তিনি মর্তে সুখে রাজত্ব করেন। যজ্ঞে, দানে ও প্রজাবর্গের কল্যাণ-সাধনে তিনি ছিলেন সদাই ব্রতী, পত্নী শৈব্যা আর একমাত্র পুত্র রোহিতাশ্বকে নিয়ে তাঁর দিন অতিবাহিত হ'ত।

একবার কোন কারণে ঋষি বিশ্বামিত্র মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের ওপর অসন্তুষ্ট হন। তিনি শিষ্যদের নিয়ে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের রাজ-দরবারে এসে উপস্থিত হলেন। ঋষি ও তাঁর শিষ্যবর্গকে দেখে মহারাজ তাঁদের পাদ্য-অর্ঘ্যের ব্যবস্থা করলেন। বিশ্বামিত্র তখন হরিশ্চন্দ্রের কাছে সসাগরা পৃথিবী দান-হিসেবে চাইলেন। দানবীর হরিশ্চন্দ্রের কাছে কেউই কোনদিন কিছু চেয়ে বিমুখ হননি। সুতরাং, তিনি আজ কেমন করে বিশ্বামিত্রকে তাঁর প্রার্থনা থেকে বিমুখ করবেন! তা তো আর হ'তে পারে না। বিশ্বামিত্রকে তিনি সসাগরা পৃথিবী দান করলেন।

বিশ্বামিত্র দান গ্রহণ করে বললেন, দানের দক্ষিণা না দিলে দানের কোন মর্যাদা থাকে না। তাঁকে এখন দক্ষিণা দিতে হবে। বিশ্বামিত্র দক্ষিণা-হিসেবে সাত কোটি স্বর্ণমুদ্রা চাইলেন।

হরিশ্চন্দ্র রাজকোষ থেকে এই স্বর্ণমুদ্রা দিতে গেলেন। তখন বিশ্বামিত্র বললেন, হরিশ্চন্দ্র তাঁকে সসাগরা পৃথিবী দান করার পর, তাঁর আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। হরিশ্চন্দ্রকে সপরিবারে তখনই সব ছেড়ে চলে যেতে হবে এবং সাতদিনের মধ্যে তাঁকে দক্ষিণা-বাবদ সাত কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিতে হবে।

সত্যরক্ষার জন্য হরিশ্চন্দ্র সপরিবারে রাজধানী ছেড়ে চলে গেলেন এবং পুণ্যধাম বারাণসীতে আশ্রয় নিলেন। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র সত্যরক্ষার জন্য আজ পথের ভিক্ষুক। অসহায় পত্নী শৈব্যা ও ক্ষুধার্ত পুত্র রোহিতাশ্বকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলেছেন পথে পথে ; তাঁর কেবল চিন্তা—কিভাবে তিনি বিশ্বামিত্রকে দানের দক্ষিণা দেবেন ?

শেষ পর্যন্ত হরিশ্চন্দ্র এক ব্রাহ্মণের কাছে পত্নী শৈব্যাকে বিক্রয় করলেন। শৈব্যার অনুরোধে সেই ব্রাহ্মণ একান্ত অনিচ্ছায় শৈব্যার পুত্রকে তাঁর গৃহে থাকবার অনুমতি দিলেন। হরিশ্চন্দ্র এবার নিজেকে কাশীর কালু ডোমের নিকট বিক্রয় করলেন—কাশীর মহাশ্মশানে তাঁকে মড়া পোড়াতে হবে। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আজ শ্মশানের ডোম—ভাগ্যের কি অদ্ভুত পরিহাস! এভাবে, স্ত্রীকে ও নিজেকে বিক্রয় করে তিনি সাত কোটি স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করে, বিশ্বামিত্রকে দানের দক্ষিণা দিলেন।

হরিশ্চন্দ্র কাশীর শ্মশানে মড়া পোড়ানোর কাজ করেন এবং মড়া পিছু পঞ্চাশ কাহন কড়ি কর নেন। ওদিকে শৈব্যা ব্রাহ্মণের কাছে রোহিতাশ্বকে নিয়ে দাসীবৃত্তি করতে থাকেন। রোহিতাশ্বের কাজ ব্রাহ্মণের পূজার ফুল তোলা। একদিন ফুল তুলতে গিয়ে, যেই সে গাছে হাত দিয়েছে, অমনি গাছের ডাল থেকে এক বিষধর সাপ তার হাতে ছোবল মারল। সাপের বিষে রোহিতাশ্ব মারা গেল।

সারাদিন কাজের পর শৈব্যা ছেলেকে দেখতে না পেয়ে, ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদতে লাগলেন। পরে, বনের এক ধারে দেখতে পেলেন, তাঁর

ছেলে সেখানে মরে পড়ে আছে। শৈব্যার সে কি বুকফাটা কান্না। শেষ পর্যন্ত শৈব্যা মরা ছেলেকে পোড়াতে গেলেন কাশীর মহাশ্মশানে।

মড়া দেখে হরিশ্চন্দ্র পোড়াবার জন্য এগিয়ে এলেন। বললেন, মড়া পোড়াতে পঞ্চাশ কাহন কড়ি লাগবে। কিছুই তো নেই শৈব্যার কাছে। মড়া পোড়ানোর কড়ি না দিলে কিছুতেই সেখানে মড়া পোড়ানো যাবে না। মা তাঁর মরা ছেলেকে কোলে নিয়ে কেবল কপাল চাপড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন।

আঁধার রাত—তার ওপর আবার অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। আজ শৈব্যার আপনজন বলতে আর কেউ নেই যে, এ বিপদে তাঁকে সাহায্য করবেন। চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে শৈব্যা বললেন, কোথায় মহারাজ হরিশ্চন্দ্র। দেখে যাও, তোমার ছেলের ও স্ত্রীর আজ কি দুর্দশা। হরিশ্চন্দ্র বিস্মিত হয়ে তাকালেন। বিদ্যুতের আলোকে উভয়ে উভয়কে চিনতে পারলেন। তখন ছেলের মরা দেহ জড়িয়ে দুজনের কি আকুল কান্না!

চিতা সাজানো হ'ল—সেই চিতায় তুলে দেওয়া হ'ল ছেলে রোহিতাশ্বের মৃতদেহ। পাশে আর একটি বড় চিতা সাজানো হ'ল। উদ্দেশ্য, সেই চিতায় স্বামী-স্ত্রী দুজনে একসঙ্গে পুড়ে মরবেন। চিতায় আগুন দেবার আগে দুজন দুজনকে আর একবার ভাল করে দেখে নিলেন।

এমন সময় স্বয়ং ধর্মরাজ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। ধর্মরাজ বললেন, তোমাদের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ধর্মরাজের দয়ায় পুত্র রোহিতাশ্বের জীবন ফিরে এল। এদিকে হরিশ্চন্দ্রের মনিব কালু ডোম এসে হরিশ্চন্দ্রকে তাঁর দাসত্ব থেকে মুক্তি দিলেন। ওদিকে শৈব্যার সেই ব্রাহ্মণ মনিব সেখানে এসে বললেন, তোমার দাসীত্বের অবসান ঘটেছে। এখন থেকে তুমিও মুক্ত। হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা এখন মুক্ত হলেন কিন্তু তাঁরা তখন কোথায় যাবেন? তাঁদের যাওয়ার যে আর কোন জায়গা নেই।

বিশ্বামিত্রও তখন উপস্থিত হয়ে হরিশ্চন্দ্রকে তাঁর যথা সর্বস্ব ফিরিয়ে দিতে চাইলেন। বিশ্বামিত্র বললেন, তোমার রাজ্য তুমি এখন ফিরিয়ে নাও—আমি এখন তপস্যায় যাব। দানবীর হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে তাঁর নিজ রাজ্য ফিরে পেলেন এবং ছেলে ও স্ত্রী নিয়ে সুখে রাজ্যপালন করতে লাগলেন। সত্যরক্ষার জন্য আর ত্যাগের মহিমায় অমর হয়ে রইলেন দানবীর রাজা হরিশ্চন্দ্র।

"সত্য-রক্ষা হেতু রাজা হরিশ্চন্দ্র নাম।
যাঁর নামে পাপী তাপী পায় পরিত্রাণ ॥"



সতী সাবিত্রী

মদ্রদেশের রাজার নাম অশ্বপতি। তিনি দানশীল ও পরোপকারী ছিলেন। দীর্ঘকাল পরে তাঁর একটি কন্যা হ'ল ; তাঁর নাম রাখলেন —সাবিত্রী। কন্যা যেন মূর্তিমতী দেবী। যেমনি তাঁর রূপ-গুণ, তেমনি তাঁর সুন্দর স্বভাব। সাবিত্রী ধীরে ধীরে বড় হয়ে বিবাহযোগ্যা হলেন।

শাল্বদেশের অধিপতি দ্যুমৎসেন তখন রাজ্য হারিয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বনে বনে ঘুরছেন। এমন সময় একদিন সাবিত্রী দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানকে দেখলেন। সাবিত্রী তাঁকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করলেন। যথাকালে সাবিত্রী তাঁর পিতার কাছে সত্যবানের কথা বললেন। পিতা অশ্বপতি কি করে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির হাতে তাঁর কন্যাকে সম্প্রদান করবেন ? তিনি তখন নারদের সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলেন। নারদ সত্যবানের কথা জানতেন। তিনি বললেন, পাত্র হিসেবে সত্যবান সবদিক থেকে ভাল। কিন্তু তাঁর আয়ু অত্যন্ত কম এবং এক বছরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হবে।

নারদের পরামর্শে অশ্বপতি তাঁর কন্যাকে সব বোঝালেন। কিন্তু সাবিত্রী তাঁর নিজ সঙ্কল্পে অটল। তিনি বললেন, মনে মনে আমি যখন

তাঁকে পতিত্বে বরণ করেছি, তখন তিনিই আমার পতি। তাঁর আয়ু কম হোক্, তবু তিনিই আমার স্বামী। অগত্যা পিতা অশ্বপতি সত্যবানের হাতেই তাঁর কন্যা সম্প্রদান করলেন।

একদিন মহর্ষি নারদ এসে বলে গেলেন, সত্যবানের আয়ু আর মাত্র চার দিন। এ কথা শুনেই সাবিত্রী খুব চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। সাবিত্রী স্বামীকে বাঁচাবার জন্য ত্রি-রাত্রি ব্রত গ্রহণ করলেন। সাবিত্রীর কঠোর সাধনা দেখে, তাঁর শ্বশুর তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, মা, তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হবে। সত্যবানকে তোমার কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবেন না।

ত্রি-রাত্রি ব্রত পালন করে, সাবিত্রী যথাদিনে ব্রত ভঙ্গও করলেন। চতুর্থ দিন সত্যবান কুঠার হাতে বেরুলেন বনে কাঠ কাটতে। সাবিত্রী বললেন—তিনিও সত্যবানের সঙ্গে বনে যাবেন। কিছুতেই সাবিত্রীকে ফেরানো গেল না। অগত্যা সত্যবান রাজী হয়ে সাবিত্রীকে সঙ্গে নিলেন।

সত্যবান ও সাবিত্রী দুজনে প্রচুর কাঠ সংগ্রহ কারলেন। অনেক ফুল-ফল সগ্রহ করার পর, অকস্মাৎ সত্যবান অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা—গায়ে দরদর করে ঘাম বইছে; ঘুমে দেহ যেন অবশ হয়ে আসছে। সাবিত্রী স্বামীর কথা শুনে বুঝলেন—নারদের কথামত সেই সঙ্কটকাল উপস্থিত। মাটিতে বসে স্বামীর মাথা কোলে নিয়ে, তিনি তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলেন।

কিছু পরে সাবিত্রী দেখলেন, মৃত্যুদণ্ড হাতে স্বয়ং যমরাজ উপস্থিত। যমরাজ বললেন, তোমার স্বামীর কাল পূর্ণ হওয়ায়, আমি তাঁকে নিতে এসেছি। সাবিত্রী যমরাজকে প্রণাম করে বললেন, আপনি নিজে এসেছেন কেন?

যমরাজ উত্তরে বললেন, তোমার স্বামী সত্যবান ধার্মিক ও সত্যবাদী বলে আমি নিজেই তাঁকে নিতে এসেছি। এই বলে তিনি সত্যবানের

দেহ থেকে তাঁর প্রাণ নিয়ে চললেন। সাবিত্রীও যমরাজের পিছু পিছু চলতে লাগলেন।

সত্যবানের মৃতদেহ সেখানে পড়ে রইল। সাবিত্রীকে সঙ্গে সঙ্গে আসতে দেখে যমরাজ বললেন, কেন তুমি আমার সঙ্গে আসছো ? বরং তুমি তোমার স্বামীর মৃতদেহ সংকারের আয়োজন কর। উত্তরে সাবিত্রী বললেন, আমার স্বামী যেখানে যাবেন, সেখানেই আমার গতি। আপনি ধর্মরাজ, আপনি তো সবই জানেন। আমার স্বামী ছাড়া আমি কিছুই জানি না। তাই আমার স্বামীকে ছেড়ে আমি অন্য কোথাও যেতে পারবো না।

যমরাজ পড়লেন মহা বিপদে। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন, স্বামীর জীবন ছাড়া তুমি অন্য যা কিছু চাও, আমি তা পূর্ণ করব।

সাবিত্রী বললেন, তবে আপনি বর দিন, যাতে আমার শ্বশুর তাঁর হারানো রাজ্য ফিরে পেয়ে সুখে দীর্ঘকাল রাজত্ব করতে পারেন।

তখন যমরাজ বললেন, তথাস্তু।

সাবিত্রী তখনও যমরাজের পেছনে পেছনে চলেছেন। যমরাজ তাঁকে ফিরে যেতে বললেন। তুমি তোমার স্বামীর জীবন ছাড়া আর একটি বর প্রার্থনা কর।

সাবিত্রী দ্বিতীয় বর চাইলেন—আমার শ্বশুর যেন তাঁর হারানো দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান।

যমরাজ বললেন—তথাস্তু।

তবুও সাবিত্রী ফিরছেন না। সাবিত্রীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলেছেন যমরাজ—কিন্তু তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারছেন না। যমরাজ সাবিত্রীর কথায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে তৃতীয় বর দিতে চাইলেন।

সতী-সাধ্বী এবার বর চাইলেন, তিনি যেন শতপুত্রের জনন হতে পারেন।

যমরাজ বললেন, তথাস্তু।

সাবিত্রী এবার বললেন, যমরাজ তাঁকে শতপুত্রের জননী হওয়ার বর দিয়েছেন, কিন্তু স্বামী না থাকলে তিনি শতপুত্রের জননী হবেন কি করে! ধর্মরাজের বর মিথ্যা হবার নয়! আপনি আমার স্বামীর জীবন দান করুন। হে ধর্মরাজ, সত্যবান জীবিত হোক; আপনার বাক্য সত্য হোক। ধর্মরাজ তখন নিরুপায় হয়ে সত্যবানের জীবন ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার স্বামী দীর্ঘজীবন লাভ করুন; তোমার নিষ্ঠায় সকল দেবতা মুগ্ধ হয়েছেন।

ধর্মরাজ যমের বরে দ্যুমৎসেন ফিরে পেয়েছেন তাঁর দৃষ্টিশক্তি। তিনি দেখলেন, বনের মধ্যে অন্ধকার পথ দিয়ে স্বামী সত্যবানের হাত ধরে ঘরে ফিরে আসছেন তাঁর পুত্রবধূ সাবিত্রী। যমরাজের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন সাবিত্রী সমস্ত তাঁর শ্বশুরের কাছে বর্ণনা করলেন। সতীর সতীত্ব নিষ্ঠায় সকলেই বিস্মিত হলেন। পিতার মৃত্যুর পর সত্যবান রাজা হয়ে সুখে রাজ্যপালন করতে লাগলেন। সাবিত্রীর সতীত্ব-মহিমা জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে রইল।

সতী-সাধ্বী সাবিত্রী, স্বামী সত্যবান।
মহা পুণ্যফলে, যম দিলা প্রাণ দান॥



ধ্রুবের তপস্যা

মহারাজ উত্থানপাদের দুই পত্নী—সুনীতি ও সুরুচি। কনিষ্ঠা সুরুচিকে রাজা বেশি ভালবাসেন ; তাই সুরুচির পুত্র উত্তমকে তিনি সকল সময়েই যত্ন-আদর করেন। জ্যেষ্ঠা পত্নী সুনীতি স্বামীর স্নেহে বঞ্চিতা ; তাঁর দিন কাটে পুত্র ধ্রুবকে নিয়ে। সুরুচি ধ্রুবকে দেখতে পারেন না ; ধ্রুবও তাঁর পিতার কাছে যেতে পারেন না। ধ্রুবের মনে যে কি দুঃখ, তা তাঁর মা সুনীতিই একমাত্র বোঝেন, আর বোঝেন অন্তর্যামী ভগবান।

একদিন বালক ধ্রুব তাঁর পিতার কোলে বসতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু সুরুচি এসে তাঁকে ধমক দিলেন। ধ্রুব মায়ের কাছে গিয়ে তাঁর মনের দুঃখ প্রকাশ করলেন। মা ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন, বাবা, তুমি তোমার দুখিনী মায়ের ছেলে। বাবার আদর পাবার ভাগ্য নিয়ে তুমি জন্মাও নি। তুমি ভগবানকে একমনে ডাক—তিনিই তোমার সব দুঃখ দূর করবেন।

মায়ের কথা শুনে বালক ধ্রুব বনের পথ ধরে এগিয়ে চললেন। পথে নারদের সঙ্গে দেখা। নারদ তাঁকে বাড়ীতে ফিরে যাবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু ধ্রুবের মনে তখন এক সঙ্কল্পের দৃঢ়তা। মায়ের কথা অনুযায়ী অন্তর্যামী ভগবানকে ধ্রুব তাঁর মনের দুঃখ বোঝাতে চান।

ভগবানই কেবল তাঁর দুঃখ দূর করতে পারবেন। কোথায় গেলে সেই ভগবানের দেখা পাওয়া যাবে ?

ধ্রুবের একাগ্রতার পরিচয় পেয়ে নারদ বললেন, তোমার মা ঠিক কথাই বলেছেন। তুমি একমনে ভগবান শ্রীহরির তপস্যা কর। তিনিই তোমার মনের দুঃখ বুঝবেন। যমুনাতটে মধুবনে শ্রীহরি আছেন। তুমি সেখানে গিয়ে একমনে তাঁকে ডাক।

বালক ধ্রুব যমুনাতটে একমনে শ্রীহরির ধ্যান করতে লাগলেন। তাঁর মনে কেবল সেই মূর্তির ধ্যান—নীরদ নয়ন, নবীন মেঘের মত শ্যামবর্ণ শ্রীহরির রূপ, চার হাতে তাঁর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম, পরিধানে পীতবসন। বালক ধ্রুব আর কিছু জানেন না। কেবল, সেই রূপের ধ্যান। চোখের জলে বালকের বুক ভেসে যায়। কেবলই ডাকতে থাকেন—কোথায় তুমি শ্রীহরি! আমাকে দেখা দাও ; আমার মনের কষ্ট তুমি কি বুঝতে পার না ?

বনের মধ্যে ধ্রুব একাকী কঠিন তপস্যায় নিমগ্ন। বনে কত বাঘ, ভালুক, আরও কত ভয়ঙ্কর জীবজন্তু। সেদিকে তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। একমনে কেবল শ্রীহরির চিন্তা। বাঘ, ভালুক প্রভৃতি তাঁর কাছে এল—কিন্তু তাঁর কোন ক্ষতি না করে, তারা মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। ধ্রুব বালক ; তাঁর ভয় নেই কোন কিছুতেই। মায়ের কাছে তিনি শুনেছেন—শ্রীহরিকে একমনে ডাকলে, কেউ তাঁর কোনও ক্ষতি করতে পারবেন না।

ধ্রুবের কঠিন তপস্যায় দেবতারা সকলেই চিন্তিত হলেন। তাঁরা তখন ভগবান শ্রীহরির শরণ নিলেন। শ্রীহরি সকল দেবতাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, অচিরেই তিনি ধ্রুবকে দেখা দেবেন এবং ধ্রুবের মনের সাধ পূর্ণ করবেন। দেবতারা ফিরে গেলেন। ধ্রুবের কঠিন তপস্যার বিরাম নেই—একাগ্রচিত্তে শ্রীহরির ধ্যান করতে করতে বালক ধ্রুবের ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব চলে গেছে। শ্রীহরির নামই এখন তাঁর একমাত্র ধ্যান।

ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীহরি ভক্তের ব্যাকুল ডাকে সাড়া না দিয়ে আর থাকতে পারলেন না। তিনি এলেন বালক ধ্রুবের কাছে অপূর্ব সুন্দর নয়ন-মনোহর রূপে। তিনি এসেছেন এক বালকের বেশে। তাঁর আরাধ্য ভগবান শ্রীহরিকে কাছে পেয়ে বালক ধ্রুব বাক্যহীন— মুখে তাঁর কোন ভাষা নেই। জোড় হাতে নীরবে দাঁড়িয়ে বালক ধ্রুব— তাঁর চোখে শুধু জল ঝরছে। ভক্ত আর ভগবান দুজনে পাশাপাশি— দুজনে নির্বাক।

কিছুক্ষণ পরে বালক ধ্রুব ভগবান শ্রীহরিকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। শ্রীহরিও তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন; বললেন, ধ্রুব! তুমি ফিরে যাও তোমার বাবার কাছে। তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হোক। তোমার তপস্যার শক্তিতে তোমার স্থান হবে নিত্যলোকে এবং তা হবে ধ্রুবলোক। সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রের মতই পৃথিবীর মানুষ সর্বদা তোমাকে দেখবেন— সেই ধ্রুবলোকে। এই বলে ভগবান অন্তর্ধান করলেন।

এদিকে পিতা উত্থানপাদ এতদিন পরে তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন। তিনি তাঁর কনিষ্ঠা পত্নী সুরুচির জন্য বালক ধ্রুবকে তিনি একটুও স্নেহ দেখাতে পারেননি। বালক বিমাতা সুরুচির গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে অভিমানে একাকী বনে গেছে। তিনি আর মনের দুঃখ সহ্য করতে না পেরে পুত্রের সন্ধানে বেরিয়েছেন। দৈববাণী শুনলেন—ধ্রুবের তপস্যা সার্থক হয়েছে। সেই তপস্যার মহিমায় ধ্রুবলোকে হবে তার অধিষ্ঠান।

রাজা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটেছেন বনের পথে। পেছনে পেছনে চলেছেন বিমাতা সুরুচি। তিনিও এতদিনে তাঁর নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন। আর সেই সঙ্গে চলেছেন দুখিনী জননী সুনীতি তাঁর পুত্রের সন্ধানে।

ধ্রুব তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে ফিরে চলেছেন। শ্রীহরি তাঁকে অলক্ষ্যে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। ধ্রুব চলেছেন—সেই সঙ্গে

বাঁশী বাজাতে বাজাতে অলক্ষ্যে চলেছেন শ্রীহরি। পথে পিতা-পুত্রে সাক্ষাৎ। মহারাজ উত্থানপাদ বুকে জড়িয়ে ধরেন পুত্র ধ্রুবকে। সুনীতি ও সুরুচি এসে মিলিত হলেন। ধ্রুব প্রসন্নচিত্তে সকলের পদ-বন্দনা করলেন। শ্রীহরি অলক্ষ্যে থেকে সকলকে আশীর্বাদ করলেন।

ধ্রুব তারপর যুবরাজ-পদে অভিষিক্ত হলেন। প্রজারাও তাঁকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। মহারাজ উত্থানপাদ বৃদ্ধ বয়সে ধ্রুবের হাতে রাজ্যভার দিয়ে ভগবদ্-ভজনের জন্য বনে গেলেন। ধ্রুব রাজা হয়ে দীর্ঘকাল রাজ্যপালন করে অবশেষে ধ্রুবলোকে গমন করলেন।

হরি নামে ব্যকুলতা এক মন-প্রাণ।
ধ্রুবের তপস্যা তার সকল প্রমাণ॥

———



নল দময়ন্তী

বিদর্ভরাজ ভীমের এক কন্যা—নাম দময়ন্তী। তিনি রূপে-গুণে অতুলনীয়া। দময়ন্তীর বিবাহের জন্য বিদর্ভরাজ খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। রাজকুমারী দময়ন্তীর রূপ-গুণের কথা শুনে তাঁকে বিবাহ করার জন্য দেশ-বিদেশের রাজারাও আকুল হয়ে উঠলেন।

নিষধদেশের রাজা বীরসেনের পুত্র নলের রূপ-গুণের খ্যাতি তখন চতুর্দিকে। দময়ন্তী লোকের মুখে মুখে নলরাজের কথা শুনলেন। ওদিকে নলরাজও শুনেছেন দময়ন্তীর কথা। কেউ কাউকে চোখে দেখেননি, শুধু নাম শুনে দুজন দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হলেন।

একদিন এক ঝাঁক রাজহাঁস নলের প্রমোদকাননে উড়ে এল। নল এদের একটিকে ধরলেন। রাজহাঁস নলকে তখন বলল, যদি নল তাকে ছেড়ে দেন, তবে সে তাঁকে বিদর্ভ রাজকন্যা দময়ন্তীর মনের কথা এনে দেবে। নল কৌতূহলী হয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন। রাজহাঁস তখন দময়ন্তীর কাছে উড়ে গেল—তাঁর কাছে জানাল নলের কথা। রাজহাঁসের মুখে দময়ন্তী নলরাজার কথা শুনে তাকে আদর ক'রে তাঁর মনের সব কথা বললেন। রাজহাঁস ফিরে এসে নলরাজার কাছে দময়ন্তীর সব কথা বলল। দুজন দুজনের মনের কথা জানলেন। সাক্ষী রইল সেই রাজহাঁস।

বিদর্ভরাজ ভীম এবার তাঁর কন্যার বিবাহের জন্য এক স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করলেন। নানা দেশের রাজারা সেই স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হলেন। স্বর্গলোকও এ-কথাটা রটে গেল। ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ —এই চার দেবতাও সেই স্বয়ম্বর সভায় এলেন। নারদের কথায় নিষ্ধদেশের রাজকুমার নলও তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চললেন।

এই স্বয়ম্বর সভায় কেবল বড় বড় রাজাদের ও দেবতাদের আমন্ত্রণ। নল সেখানে যাবেন কিভাবে! শেষ পর্যন্ত নলের আগ্রহ দেখে দেবতারা তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। তাঁরা নলকে তাঁর ইচ্ছামত স্থানে যাবার বর দিলেন। বর পেয়ে রাজা নল দময়ন্তীর প্রমোদকাননে গিয়ে দময়ন্তীর মনের কথা জানতে চাইলেন। দময়ন্তী উত্তরে বললেন, আমার মনের কথা তো আমি সব বলেছি রাজহাঁসের কাছে। এখন সভায় উপস্থিত হয়ে আমার সত্যরক্ষা কর। আমি যে মনে মনে তোমাকেই পতিত্বে বরণ করেছি।

স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত সকল দেবতা ও রাজাদের মধ্যে দময়ন্তী মালা পরিয়ে দিলেন নলের গলায়। উপস্থিত দেবতারা এতে সন্তুষ্ট হলেন এবং খুশী মনে তাঁদের আশীর্বাদ করলেন।

এদিকে দ্বাপরের সঙ্গে কলি চলেছেন স্বয়ম্বর সভায়। পথে দেবতাদের মুখে কলি শুনলেন যে, স্বয়ম্বর সভা শেষ হয়েছে এবং দময়ন্তী নলরাজার গলায় মালা দিয়েছেন। কলি এই কথা শুনেই রাগে জ্বলে উঠলেন। দেবতাদের উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষের গলায় মালা দেওয়া! এজন্য নলকে শাস্তি পেতেই হবে। দেবতারা অনেক করে কলিকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু, কলিকে শান্ত করা গেল না।

একদিন স্নান না ক'রে নল সন্ধ্যা-বন্দনা করতে বসেছেন। এই সুযোগে কলি নলের শরীর প্রবেশ করলেন। কলি যার শরীরে প্রবেশ করেন, তার আর রক্ষা নেই—তাকে সর্বস্বান্ত হ'তে হয়। নল বুঝতেই পারলেন না যে, কলি তাঁর শরীরে প্রবেশ করেছেন।

এদিকে নলরাজের জ্ঞাতিভাই পুষ্কর কলির প্ররোচনায় নলকে পাশাখেলায় আহ্বান করলেন। শেষ পর্যন্ত পাশাখেলায় রাজা নল কলির প্রকোপে সর্বস্বান্ত হলেন। এক এক করে তিনি সব হারালেন। অবশেষে দময়ন্তীকে পণ রেখে পাশা খেলার আহ্বান এল। নলরাজা কিন্তু বুঝতে পারলেন যে, তাঁর সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে। তিনি আর খেলতে চাইলেন না। একবস্ত্রে দময়ন্তীর হাত ধরে নলরাজা রাজপুরী ছেড়ে গেলেন। ইতিমধ্যে পাশা খেলায় তিনি রাজ্যও হারিয়েছেন। সুতরাং, রাজপুরীতে থাকারও অধিকার তাঁর নেই।

নল ও দময়ন্তী মনের দুঃখে গভীর বনে চলে গেলেন। তাঁরা তিন দিন অনাহারে আছেন। তাঁরা দেখলেন এক ঝাঁক পাখী সামনে এসে বসেছে। নল তাঁর পরিধেয় বস্ত্র দিয়ে পাখী ধরবার চেষ্টা করলেন। পাখীগুলি সেই কাপড় নিয়ে উড়ে চলে গেল। বিবস্ত্র অবস্থায় নল লজ্জায় পড়লেন। দময়ন্তী তাঁর কাপড়ের অর্ধাংশ নলকে পরতে দিলেন এবং নলকে দময়ন্তীর পিত্রালয়ে যাবার জন্যে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু, নলরাজ সম্মত হলেন না।

একদিন ক্ষুধায় কাতর হয়ে দুজনে ঘুমিয়ে পড়েছেন। মাঝরাতে নল তাঁর পত্নী দময়ন্তীকে ছেড়ে চলে যাবার জন্য মনস্থ করলেন। আধখানি পরণের কাপড় নিয়ে নল কলির প্রভাবে গভীর বনের মধ্যে দময়ন্তীকে একা ফেলে চলে গেলেন। দময়ন্তী ঘুম থেকে উঠে তাঁর স্বামীকে বনে বনে খুঁজতে লাগলেন। এমন সময় একটা প্রকাণ্ড অজগর তাঁকে গ্রাস করতে এল।

ভাগ্যক্রমে এক ব্যাধ দময়ন্তীকে রক্ষা করল। স্বামীকে খুঁজতে খুঁজতে দময়ন্তী এক তপোবনে এসে পৌঁছুলেন। সেখানে ঋষিদের কাছে সব জানালেন। ঋষিরা দময়ন্তীর সব কথা শুনে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। উন্মাদিনীর মত দময়ন্তী ছুটে চলেছেন স্বামীর খোঁজে। পথে নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে তিনি শেষ পর্যন্ত এলেন চেদিরাজ সুবাহুর রাজ্যে। সেখানে রাজা, তাঁর মুখে সব কথা শুনে রানী তাঁকে মেয়ের মত আশ্রয়

দিলেন। মহারানীর চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত দময়ন্তী ফিরে যেতে পারলেন আপন পিতৃরাজ্যে।

এদিকে দময়ন্তীকে ফেলে নল একাকী বনপথে চলেছেন। যেতে যেতে দেখতে পেলেন নারদের শাপে অভিশপ্ত নাগরাজকে। নলের স্পর্শে নাগরাজের মুক্তি হ'ল। মুক্তি পেয়ে নাগরাজ নলকে দংশন করলেন। যাতে নাগরাজের দংশনে বিষের জ্বালায় নলকে ছেড়ে চলে যেতে পারেন, সেই জন্যেই এই দংশন। নাগরাজ নলকে একখানি বস্ত্র দিয়ে বললেন—যখন তুমি কলির প্রকোপ থেকে মুক্ত হবে—তখন এই বস্ত্রখানি পরলেই তোমার পূর্ব দেহকান্তি ফিরে পাবে।

নল এবার অযোধ্যায় এসে ঋতুপর্ণ রাজার সারথির কাজ নিলেন। এদিকে বিদর্ভরাজ ভীম চতুর্দিকে লোক পাঠালেন নলের সন্ধানে। কিন্তু কোথাও তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না। নলরাজকে কেউ চিনতেও পারল না। কারণ, নাগরজের দংশনে তাঁর দেহ ইতিমধ্যে বিকৃত হয়ে গেছে।

দময়ন্তীর এক সখী কেশিনী নলরাজের দেহে কতকগুলি চিহ্ন দেখে বুঝতে পারলেন যে, ঋজুপর্ণ রাজার বিকৃত-দেহী সারথিই স্বয়ং রাজা নল। তিনি এসে দময়ন্তীকে এ সংবাদ দিলেন। দময়ন্তীর তাঁর পিতার কাছে সখী কেশিনীর কথা নিবেদন করলেন। দময়ন্তীর বাবা সব শুনে আনন্দ প্রকাশ করলেন।

বিদর্ভরাজ ভীম অয্যেধ্যায় এসে ঋতুর্ণকে সন্তুষ্ট করে নলকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। নলরাজা তাঁর বিকৃত দেহ নিয়ে যাবেন কি করে? দময়ন্তী ঐ বিকৃত দেহেই নলরাজকে গ্রহণ করতে চাইলেন। তিনি নিষ্পাপ ও সতী; তাই যা কিছু ঘটুক না কেন, তিনি তাঁর স্বামীকে ফিরে পেতে চান। নলরাজ সব বুঝলেন। এবার তিনি সেই নাগরাজের দেওয়া বস্ত্র যেই পরলেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই রাজা নল ফিরে পেলেন তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর রূপ। ততক্ষণে কলি তাঁর দেহ থেকে বিষের জ্বালায় ছেড়ে চলে গেছেন। এভাবে আবার নল ও দময়ন্তীর পুনর্মিলন হ'ল।

বিদর্ভ নগরে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। জ্ঞাতিভাই পুষ্কর এবার ফিরিয়ে দিতে চাইলেন রাজা নলকে তাঁর রাজ্য। রাজা নল ও দময়ন্তী পুনরায় তাঁদের রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হ'লেন। সত্য ও ত্যাগের মহিমা ঘোষিত হ'ল। নল ও দময়ন্তীকে দেবতারা প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। দময়ন্তীর সতীত্ব-মহিমা পুরাণে খ্যাত হ'য়ে রইল।

কলি-শাপে কষ্ট পায় দময়ন্তী-নল।
সত্য-পথে দুঃখ বটে, আনন্দ প্রবল॥



রামের অশ্বমেধ ও রামায়ণ গান

সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর বনবাসে কাটিয়ে রাজা রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে এসেছেন। তিনি রাজ্যের ভার নিয়েছেন নিজের হাতে। প্রজারাও বেশ সুখ-শান্তিতে আছেন। প্রজানুরঞ্জক রাজা ঘোষণা করেছেন, প্রজাদের সুখের জন্য তিনি নিজের সব সুখ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত।

কিছুদিনের মধ্যে তিনি শুনতে পেলেন, প্রজাদের মধ্যে কথা উঠেছে, সীতাদেবীকে রাবণ চুরি করেছিলেন এবং লঙ্কাপুরীতে বন্দী করে রেখেছিলেন; সেই সীতাদেবীকে পরীক্ষা না করে রামচন্দ্র কিভাবে আবার তাঁকে ঘরে এনেছেন। রামচন্দ্র তখন সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য সীতাকে বনবাসে পাঠাবেন। লক্ষ্মণ ও সারথি সুমন্ত্রের সঙ্গে পরামর্শ করে রামচন্দ্র সীতাকে বাল্মীকির তপোবনে পাঠালেন। বাল্মীকির আশ্রমে সীতার দুই পুত্র হ'ল।

সীতাকে ত্যাগ করে রামচন্দ্রের মনের দুঃখে দিন কাটে। তাই তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে মনস্থ করলেন। রামচন্দ্রের যজ্ঞের কথা শুনে স্বয়ং ব্রহ্মা আনন্দিত হলেন। তিনি বিশ্বকর্মাকে ডেকে যজ্ঞস্থান নির্মাণের আদেশ দিলেন। সুবিশাল যজ্ঞশালা প্রস্তুত হ'ল এবং সেই যজ্ঞশালা দেখবার জন্য দেবগণ, মুনি-ঋষি সকলেই উপস্থিত হলেন। যজ্ঞও যথাকালে সুরু হ'ল।

মুনিগণের বেদমন্ত্রের মধ্যে যজ্ঞশালায় রামচন্দ্র পাশে সোনার সীতা নিয়ে বসেছেন। সীতাকে তিনি বনবাসে পাঠিয়েছেন, তাই সোনার তৈরি সীতাকে যজ্ঞে বসানো হয়েছে। অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়াকে শত্রুঘ্নের তত্ত্বাবধানে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পাঠানো হ'ল। চতুর্দিক ঘুরে সেই ঘোড়া শেষে এসে পৌঁছাল বাল্মীকির তপোবনে। ঘোড়ার কপালে জয়পত্র দেখে সীতার দুই ছেলে লব ও কুশ বুঝতে পারলেন, এ ঘোড়া রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া। তাঁরা কিছুতেই এই ঘোড়া ছাড়বেন না। দুই ভাই ঘোড়া বেঁধে রেখে মায়ের কাছে সব কথা বললেন। ঘোড়া ছেড়ে দেওয়ার জন্য শত্রুঘ্ন তাঁদের অনুরোধ করলেন। কিন্তু লব-কুশ বিনা যুদ্ধে ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে রাজী হলেন না। তখন শত্রুঘ্নের সঙ্গে লব-কুশের ভীষণ যুদ্ধ হ'ল। সেই যুদ্ধে শত্রুঘ্ন পরাজিত হলেন। শত্রুঘ্নের পরাজয়ের সংবাদ শুনে এলেন ভরত ও লক্ষ্মণ। কিন্তু তাঁরাও পরাজিত হলেন।

যথাকালে রামচন্দ্র সংবাদ পেলেন, বাল্মীকির তপোবনে দুটি বালক তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া আটকেছেন। সেই ঘোড়া ফিরিয়ে আনতে গিয়ে প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন পরাজিত হয়েছেন। আর সেই সঙ্গে রামচন্দ্রের অগণিত সেনাবাহিনীও হত হয়েছে। তখন তিনি স্বয়ং যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। পুষ্পক-রথে চেপে তিনি যুদ্ধযাত্রা করলেন। মহাবীর পবন-নন্দন হনুমানের আশী কোটি অনুচর এবং বিভীষণের অনুচর তিন কোটি রাক্ষস-সেনা সেই সঙ্গে যুদ্ধে চলল। লব-কুশ দুই ভাইও এদিকে যুদ্ধের জন্য তৈরী।

সীতাদেবী কিন্তু সবকথা জানতেন না। চতুর্দিকে যুদ্ধের আয়োজন দেখে, তিনি লব-কুশকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। দুই ভাই তখন মাকে সব বুঝিয়ে সীতাদেবীর কাছে যুদ্ধের অনুমতি চাইলেন। সীতাদেবী তাঁদের কথা শুনে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দিলেন।

রামচন্দ্রের সঙ্গেই যে এই যুদ্ধ, এ-কথা সীতাদেবী মোটেই জানতে পারলেন না।

দু'দলে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হ'ল। লব ও কুশ দুই ভাই বাল্মীকি মুনির কাছে যুদ্ধবিদ্যা শিখেছেন—তাঁদের পরাজিত করা খুব সহজ নয়। এক এক করে রামচন্দ্রের সেনাবাহিনী পরাজিত হ'ল। এবার স্বয়ং রামচন্দ্র এগিয়ে এলেন। তিনি লব ও কুশকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। তিনি জানতেন, কেবলমাত্র তাঁর পুত্রের কাছেই তাঁর পরাজয় হবে—এই ছিল তাঁর বিধির লিখন। তিনি প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে লব ও কুশকে যুদ্ধে আক্রমণ করলেন। রামচন্দ্রের অস্ত্রের আঘাতে লব কুশ দুই ভাই পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন।

কিছুক্ষণ পরে লব ও কুশ আবার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে যুদ্ধে উপস্থিত হলেন। তাঁরা মৃত্যু পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করবেন না—এই তাঁদের প্রতিজ্ঞা। নতুন উদ্যমে আবার যুদ্ধে ব্রতী হলেন তাঁরা দু'ভাই। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর ছোট ভাই কুশ রামের উদ্দেশ্যে অক্ষয়জিৎ বাণ নিক্ষেপ করলেন ; সেই বাণে রামচন্দ্র মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। পরাজিত রামচন্দ্রকে ফেলে রেখে লব ও কুশ দু'ভাই সত্বর মায়ের কাছে এসে সব কথা জানাতে উপস্থিত হলেন।

মায়ের কাছে দু'ভাই তাঁদের যুদ্ধের কথা বলতে শুরু করলেন। সীতাদেবী সব কথা শুনে ছুটে চললেন সব কিছু নিজের চোখে দেখতে। নিজের চোখে সব দৃশ্য দেখে সীতাদেবী ঘন ঘন মূর্ছা যেতে লাগলেন। কি সর্বনাশ! লব ও কুশ তাঁদের বাবা রামচন্দ্রকে পরাস্ত করেছেন, তাঁদের পিতৃব্যদেব ও রঘুবংশের সেনাবাহিনীকেও পরাস্ত করেছেন। লব ও কুশ তখনো জানতেন না যে, তাঁরা কাদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। মাকে বললেন, কেন তুমি আগে বল নি যে, রঘুকুলপতি রামচন্দ্র আমাদের বাবা। শেষে ক্ষোভে-দুঃখে তাঁরা তিনজন কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে আগুনে পুড়ে মরবার সঙ্কল্প করলেন।

সেই মতে তিনজনের জন্য তিনটি অগ্নিকুণ্ড তৈরি হ'ল। এদিকে বাল্মীকি ফিরে এসে দেখলেন—সীতা, লব ও কুশ তিনজনে আগুনে

পুড়ে মরার আয়োজন করছেন। তিনি তাঁদের সকলকে বুঝিয়ে বলে নিরস্ত করলেন।

বাল্মীকি তপোবন থেকে মৃত্যুঞ্জীবি জল এনে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও অন্যান্য সকলের ওপর ছিটিয়ে দিলেন। সকলেই প্রাণ ফিরে পেলেন। বাল্মীকি তখন রামচন্দ্রকে তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ফিরিয়ে দিলেন। রামচন্দ্র এদিকে লব ও কুশ—এই দু'জনের পরিচয় জানবার জন্য কৌতূহলী হলেন। কিন্তু বাল্মীকি বললেন, যথাকালে তাঁদের পরিচয় জানা যাবে। লব ও কুশের পরিচয় তখন তিনি দিলেন না। রামচন্দ্রও যথাকালে তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন।

বাল্মীকি যজ্ঞস্থলে লব ও কুশকে নিয়ে গেলেন রামায়ণ গান গাইবার জন্য। তিনি বেশ যত্ন করে দুই ভাইকে রামায়ণ গান শিখিয়েছেন। যজ্ঞ-সভায় সকলের সামনে লব ও কুশের রামায়ণ গান সুরু হ'ল। তাঁদের করুণ গানে পাষাণও যেন গলে যায়!

তাঁদের মধুর কণ্ঠে রামায়ণ গান শুনে রামচন্দ্র পত্নী সীতাদেবীর জন্য অধীর হলেন। রামচন্দ্রের অধীরতা দেখে বাল্মীকি প্রতিশ্রুতি দিলেন, তিনি সীতাদেবীকে আবার অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনবেন। যজ্ঞ-সভায় উপস্থিত সকলেই এ-বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। লব ও কুশের রামায়ণ গান শুনে স্বর্গ থেকে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করলেন।

লব-কুশ দুই ভাই গায় রামায়ণ।
বাল্মীকি-রচিত কথা অমৃত সমান ॥

———



সীতার পাতাল প্রবেশ

রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষ করে রামায়ণ গানের এক আয়োজন করলেন। রামায়ণ গানের কথা শুনে বহু দেশ থেকে বহু মুনি-ঋষি এলেন এই গান শোনার জন্য। বাল্মীকি সেখানে লব ও কুশকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। বাল্মীকির তপোবনে বনবাসে থাকার সময় সীতার দুই পুত্র হয়েছিল। এই দুই পুত্রই লব ও কুশ। বাল্মীকি তাঁদের যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়েছেন আর সেই সঙ্গে শিখিয়েছেন, তাঁদের রামায়ণ গান করতে। লব ও কুশ সেই রামায়ণ গান সকলের সামনে গাইবেন।

রামায়ণ গান রামচন্দ্রেরই জীবন-কথা। বাল্মীকি তপস্যাবলে জেনেছেন—রামচন্দ্রের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা। তাঁর কাছে বসে দুই ভাই লব ও কুশ আদ্যোপান্ত রামচন্দ্রের জীবন-কথা শিখেছেন। তাঁদের মুখে রামায়ণ গান শোনার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব।

দুই ভাই-এর মুখে রামায়ণ গান শুনে সকলেই মুগ্ধ। স্বয়ং রামচন্দ্র লব ও কুশের প্রকৃত পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। দুই ভাই তখন কড়জোড়ে নিবেদন করে বললেন, আমাদের জননী সীতাদেবী এবং আমরা ঋষি বাল্মীকির শিষ্য। আমাদের পিতা যে কে, তা আমরা

জানি না, তখন রামচন্দ্র সবই বুঝতে পারলেন—তিনি নীরবে অশ্রু সংবরণ করলেন।

রামচন্দ্র তখন বাল্মীকিকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন অবিলম্বে সীতাকে নিয়ে আসেন। কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা—তিন রাণীই সীতাকে দেখবার জন্য উন্মুখ; রাজ্যের সকলেই সীতাকে দেখতে চান। সীতার জন্য সকলেরই চোখে জল।

বাল্মীকি রামচন্দ্রের অনুরোধে সীতাকে অযোধ্যায় নিয়ে এলেন। সীতাদেবী এসে প্রথমেই রামচন্দ্রের চরণ-বন্দনা করলেন এবং উপস্থিত সকল গুরুজনকে প্রণাম জানালেন। বাল্মীকি তখন ধীরে ধীরে সব কথা বললেন—বনবাসে থাকবার কালে তিনি কিভাবে সীতাকে কন্যারূপে পালন করেছেন এবং কিভাবে সীতার দুই পুত্র লব ও কুশকে সকল বিদ্যা শিখিয়েছেন। তিনি বললেন—সীতা নিষ্পাপ। তাঁর দেহে ও মনে কোন পাপ নেই।

রামচন্দ্র তথাপি বললেন—পরীক্ষা না করে সীতাকে গ্রহণ করলে, প্রজারা কিছু মনে করতে পারেন। তাই তিনি অগ্নিপরীক্ষা করে অগ্নি-শুদ্ধা সীতাকে গ্রহণ করতে সম্মত হলেন। রামচন্দ্র সীতাকে বুঝিয়ে বললেন, তুমি তো এর আগে আরও পরীক্ষা দিয়েছো। সমস্ত পরীক্ষায় তুমি সহজেই উত্তীর্ণ হয়েছো। এবারেও অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে তুমি সকলকে তুষ্ট কর।

সীতাদেবী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি কখনো পতির বাক্য উপেক্ষা করেন নি—আজও করলেন না। রামচন্দ্রের তৃপ্তিতেই তাঁর আনন্দ। সকলের সামনে অগ্নিশুদ্ধা হয়ে তিনি তাঁর নিষ্পাপ চরিত্রের মহিমা দেখাবেন। সীতার এই অগ্নিপরীক্ষা দেখবার জন্য সমগ্র অযোধ্যার লোক ভেঙে পড়লেন। স্বর্গলোক থেকে দেবতারা এলেন, মুনি-ঋষিরাও এলেন তাঁদের তপোবন থেকে।

অপমানে, অভিমানে সীতাদেবী যেন আর থাকতে পারছেন না। বারংবার পরীক্ষা—তবু অবিশ্বাস। জনম দুখিনী সীতার জীবনে সুখ

একটুও নেই। সু-দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর বনবাসে কত দুঃখ তিনি সহ্য করেছেন। তারপর অযোধ্যায় ফিরে এসে, রামচন্দ্র সুখে সিংহাসনে বসেছেন। জনম-দুখিনী সীতার কপালে কিন্তু সুখ মেলেনি। প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য রামচন্দ্র তাঁকে বিসর্জন দিয়েছেন। বাল্মীকির তপোবনে দুই পুত্র লব ও কুশকে নিয়ে সদাসর্বদা রামের চিন্তায় বড় দুঃখে দিন কেটেছে। এতকাল পরে রামচন্দ্র যখন তাঁকে আনতে লোক পাঠালেন, তখন তিনি ভেবেছিলেন, এবার বুঝি তাঁর সব দুঃখ শেষ হ'ল। রামের সঙ্গে এখন থেকে আজীবন সুখে থাকবার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। আবার তাঁকে পরীক্ষা দিতে হবে ?

দুঃখে, অভিমানে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। ধরিত্রীদেবীকে বললেন, মা গো ! তুমিই আমার মা। জনম-দুখিনী অভাগিনী সীতার আজ আর কোথাও স্থান নেই। এবার তুমিই আমাকে তোমার কোলে স্থান দাও।

সীতা রব্যাকুল ডাকে বসুমতী সাড়া না দিয়ে থাকতে পারলেন না। তিনি এগিয়ে এলেন, সীতাকে তাঁর কোলে স্থান দিতে। জনম-দুখিনী সীতার জনমের মত সকল দুঃখের অবসান হোক।

সীতা পরীক্ষার জন্য অগ্নিকুণ্ডের সামনে গেলেন। সভায় সকলেই নীরব। লব ও কুশ অঝোর নয়নে কাঁদছেন, আর কাঁদছেন বাল্মীকি মুনি। সীতা সকলকে এক এক করে প্রণাম জানালেন। এবার তিনি অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন মা বসুমতীর নাম উচ্চারণ করে। সে এক করুণ দৃশ্য। সকলেই অবাক বিস্ময়ে দেখতে পেলেন, অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে এক সোনার সিংহাসন। সেই সিংহাসনে বসে আছেন মা বসুমতী ; তিনি সীতাদেবীকে তাঁর কোলে তুলে নিলেন। মা বসুমতীর কোলে বসে সীতাদেবী পাতালে চলে গেলেন।

এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে রামচন্দ্র ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি কাতর হয়ে সীতাকে ফিরে আসার জন্য চীৎকার করে ডাকতে শুরু করলেন। লব ও কুশ মা-মা বলে চীৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। বাল্মীকি ও

অন্যান্য সব মুনির চোখে জল। সেই করুণ দৃশ্যে কঠোর হৃদয়ও যেন গলে যায়। সীতা আর মর্ত্যে ফিরবেন না—পাতালে মা বসুমতীর কাছে চলেছেন।

রামচন্দ্র অনেক ক'রে অনুরোধ করলেন। জননী কৌশল্যা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। কৈকেয়ী আর সুমিত্রাও সীতাকে ফিরে আসবার জন্য বারবার বলতে লাগলেন। ততক্ষণে সীতাদেবীকে কোলে নিয়ে জননী বসুমতী অন্তর্হিত হয়েছেন। লব ও কুশ মায়ের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে মূর্ছিতপ্রায়। তাঁদের জননী সীতাদেবী আজ চলেছেন দুঃখের পৃথিবী ছেড়ে, পাতালে তাঁর মাতা বসুমতীর কোলে। পুণ্যবতী সীতার চির-শান্তির স্থান জননী বসুমতীর আশ্রয়।

সীতার চরিত্র কথা শুনে যেই লোকে।
পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য হয়, পাপ নাহি থাকে ॥

———

উপমন্যুর পরীক্ষা



পুরাকালে আয়োদ্‌ধৌম্য নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁর ছিল তিন প্রধান শিষ্য—উপমন্যু, আরুণি এবং ধৌম্য। তিন শিষ্যের মধ্যে খুব সদ্ভাব ছিল। একজন অপরজনকে না দেখে থাকতে পারতেন না। গুরুর যাতে কোন কষ্ট না হয়, সেদিকে তিন শিষ্যেরই প্রখর দৃষ্টি ছিল। তাঁরা তিনজনেই আশ্রমে থেকে গুরুর সেবা করতে লাগলেন।

ঋষি একদিন শিষ্য উপমন্যুকে ডেকে বললেন—এখন থেকে গো-পালনের দায়িত্ব তোমার ওপর দেওয়া হ'ল। আশ্রমে অনেক গরু আছে; সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এখন থেকে তোমার। উপমন্যু সকাল বেলা সব গরু নিয়ে দূর দূর মাঠে চলে যান; তাঁর সারাদিন মাঠেই কাটে। সন্ধ্যা হলে সমস্ত গরু নিয়ে ফিরে আসেন গুরুর আশ্রমে। এভাবেই কাটে দিনের পর দিন।

উপমন্যুর সঙ্গে অনেকদিন ঋষির দেখাই হয় না। ভোরবেলা উঠেই উপমন্যুকে মাঠে চলে যেতে হয়; আবার সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে তিনি ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েন। বেশ কিছুদিন পরে গুরুর সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল। গুরু তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি তো বেশ পুষ্ট হয়েছো। তুমি দিনের বেলা বনে এমন কি খাও, যাতে

তোমার স্বাস্থ্যের এই পরিবর্তন ঘটেছে। সবিনয়ে উপমন্যু উত্তর দেন, মাঠে গরু ছেড়ে দিয়ে আমি ভিক্ষায় বার হই। ভিক্ষার জিনিষ রান্না করে খাই। এরপর গুরু তাঁকে বললেন, উপমন্যু না জানিয়ে যেন ভিক্ষার কোন দ্রব্য গ্রহণ না করেন। ভিক্ষার জিনিষ আশ্রমে জমা দিতে হবে। এরপর থেকে সারাদিনের ভিক্ষান্ন গুরুর আশ্রমে উপমন্যু জমা দেন।

আবার কিছুদিন পরে ঋষির সঙ্গে উপমন্যুর দেখা। ঋষি বললেন, তুমি তো আর ভিক্ষান্ন গ্রহণ কর না।, তবু তুমি এত মোটা হচ্ছ কি করে? উপমন্যু লজ্জায় পড়লেন। তিনি অকপটে স্বীকার করলেন, মাঠে গরু চরাতে গিয়ে তিনি যখন ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েন, তখন গরুর দুধ দুয়ে খান। এবারও ঋষি খুব রুষ্ট হলেন। ঋষি বললেন, আমার অনুমতি ব্যতিরেকে কদাচ এরূপ করা উচিত নয়। উপমন্যু গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞা করে বললেন, এরূপ আর তিনি কখনো করবেন না।

কিছুদিন পরে ঋষি আবার উপমন্যুকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে দেখে ঋষি বিস্মিত হলেন। প্রশ্ন করলেন, তোমার শরীর আরও পুষ্ট হচ্ছে কি করে? তুমি তা'হলে আমার আদেশ লঙ্ঘন করে লুকিয়ে লুকিয়ে পুষ্টিকর খাদ্য কিছু খাচ্ছ?

উপমন্যু উত্তরে বললেন, তিনি অক্ষরে অক্ষরে গুরুর আদেশ পালন করে চলেছেন। তিনি দুধ খেতে নিষেধ করেছেন। তখন থেকে তিনি দুধ খাননি। তবে বাছুরগুলোর মুখে তাদের মায়ের দুধ খাবার সময় যে ফেনা বার হয়, মাত্র সেই ফেনা খেয়ে তিনি জীবন ধারণ করার চেষ্টা করেন। ঋষি উপমন্যুকে তা-ও নিষেধ করলেন।

উপমন্যু এখন থেকে আর ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেন না, দুধ খান না, দুধের ফেনাও খান না। গাছের কচি পাতা খেয়ে এখন জীবন-ধারণ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। বনে আর কোন কচি পাতা না পেয়ে, একদিন তিনি আকন্দ পাতা খেলেন। আকন্দ পাতা খেয়ে তাঁর চোখ দুটি নষ্ট হয়ে গেল। তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না—তাহলে

কেমন করে আশ্রমের গরু নিয়ে তিনি আশ্রমে ফিরবেন। রাস্তা ঠিক করতে না পেরে তিনি বনের মধ্যেই ঘুরতে লাগলেন।

সেই বনের মধ্যে এক কূপ ছিল। কূপের জল খেয়ে বনের সকলে জীবনধারণ করেন। গ্রীষ্মকালে কূপ প্রায় শুকিয়ে গিয়েছিল। রাস্তা ঠিক করতে না পেরে, উপমন্যু সেই কূপের ভেতরেই গিয়ে পড়লেন। সেখান থেকে তিনি আর কিছুতেই উঠতে পারছেন না। তখন চীৎকার করে কাঁদতে স্থুরু করলেন। কিন্তু সেই নির্জন বনে কে তাঁর চীৎকার শুনতে পাবেন? গরুগুলি যে কোথায় গেল, তারও কোন খোঁজ নেই। যথাসময়ে আশ্রমে না ফিরলে ঋষি কি মনে করবেন, এই চিন্তায় উপমন্যু অস্থির হ'য়ে পড়লেন।

এদিকে সন্ধ্যা হয়েছে। আশ্রমের শিষ্যরা সকলেই সন্ধ্যার প্রার্থনা স্থুরু করেছেন। অন্য দিন উপমন্যু আশ্রমে ফিরে এসে তাঁদের সঙ্গে সন্ধ্যায় প্রার্থনায় বসেন। আজ উপমন্যুর স্থান শূন্য। শিষ্যেরা সবাই কথাটা জানাতে ঋষির কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ঋষি সমস্ত শুনে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। উপমন্যুর কি অবস্থা! তাঁর আশ্রমের গো-বৎসগুলিরই বা কি অবস্থা! এত রাত হয়েছে; তবু উপমন্যু ফিরছে না কেন!

ঋষি ভাবলেন, উপমন্যুকে তিনি কত কষ্টই না দিয়েছেন। তাঁর মুখের অন্ন তিনি কেড়ে নিয়েছেন। হয়তো বা উপমন্যু অভিমানে আর আশ্রমে ফিরছে না। কিংবা হয়তো, ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হয়ে পথের মাঝে কোথাও অস্থিরভাবে রাত্রি যাপন করছে।

এরূপ চিন্তা করে, ঋষি তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের নিয়ে উপমন্যুর খোঁজে বেরুলেন। বনের পথ, তায় আবার অন্ধকার। কোথাও কিছু দেখা যায় না। তখন তিনি শিষ্যদের আদেশ করলেন, উপমন্যুর নাম ধরে ডাকবার জন্য। শিষ্যরা সবাই উপমন্যুকে ডাকতে স্থুরু করলেন। কিন্তু উপমন্যুর কোন উত্তর পাওয়া গেল না। ঋষি আরও খানিক দূর এগিয়ে গেলেন। বনের ভেতর যেতে যেতে রাত্রি অনেক হয়ে গেল। এবার

ঋষি আকুল কণ্ঠে নিজেই উপমন্যুর নাম ধরে ডাকতে লাগলেন —'বৎস উপমন্যু, তুমি কোথায় আছ! আমরা তোমার খোঁজ করতে এসেছি। তুমি শীঘ্র ফিরে এস। নইলে আমাদের ডাকে সাড়া দাও। আমরা তোমায় নিয়ে আসব।'

উপমন্যু কূপের মধ্য থেকেই ঋষির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। ঋষি নিজেই ডাকছেন। কিন্তু কূপ থেকে ওঠবার কোন উপায় নেই। ক্ষুধার জ্বালায় চীৎকার করেও তিনি কথা বলতে পারছেন না। ক্ষীণ কণ্ঠে উপমন্যু উত্তর দিলেন, গুরুদেব! আমার দৃষ্টিশক্তি আর নেই। আমি এই কূপের মধ্যে পড়ে আছি। কূপ থেকে আমি উঠতে পারছি না।

ঋষি উপমন্যুর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে সেই কূপের কাছে উপস্থিত হলেন। নিজের চোখে তিনি সব দেখলেন। তাঁরা সবাই মিলে উপমন্যুকে ধরাধরি করে কূপ থেকে তুললেন। উপমন্যু এবার ঋষির প্রশ্নের উত্তর এক এক ক'রে সব বলে দিলেন। শুনে ঋষি অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন।

ঋষি বললেন, তুমি আমার প্রিয়তম শিষ্য। আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম মাত্র—কিভাবে গুরুর জন্য তুমি নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতে পার! তুমি আমায় ভুল বুঝো না!

এবার ঋষি আয়োদ্‌ধৌম্য দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করতে সুরু করলেন। ঋষির প্রার্থনায় এবং শিষ্য উপমন্যুর কাতর আহ্বানে অশ্বিনীকুমারদ্বয় উপস্থিত হয়ে, তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। সকলে হৃষ্টচিত্তে আশ্রমে ফিরে গেলেন। এই উপমন্যুই পরে গুরুর আশীর্বাদে সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়েছিলেন।

ধন্য উপমন্যু! গুরু-পদে মতি।
গুরু লাগি সুখ ত্যজে, বিদ্বান সুমতি ॥



একলব্যের গুরু দক্ষিণা

দ্রোণাচার্য পাণ্ডব ও কৌরবদের অস্ত্র-গুরু। তিনি তাঁর অস্ত্রশিক্ষার শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কৌশলগুলি শিষ্যদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। অর্জুনের একাগ্রতার ও নিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে তিনি অর্জুনকে প্রিয় শিষ্যরূপে গ্রহণ করলেন এবং তাঁকে বিশেষভাবে শিক্ষা দিতে লাগলেন। অর্জুনের মত দ্বিতীয় ধনুর্ধর যে পৃথিবীতে আর কেউ নেই, এরূপ কথাও তিনি সকলকে বলতেন।

অস্ত্র-গুরু হিসেবে দ্রোণাচার্যের খ্যাতির কথা শুনে তাঁর কাছে অস্ত্র-শিক্ষা নেবার জন্য দেশ-দেশান্তর থেকে নানা শিক্ষার্থী আসতে লাগলেন। একদা নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করতে উপস্থিত হ'লেন। অস্পৃশ্য ও ম্লেচ্ছ জেনে, দ্রোণাচার্য তাঁকে শিক্ষা দিতে স্বীকৃত হলেন না।

একলব্য মনে মনে দ্রোণাচার্যকে গুরু হিসেবে মেনে নিয়েছেন। সুতরাং, দ্রোণাচার্য ছাড়া আর কারুর কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বিষণ্ণ-মনে বনের ভেতর দ্রোণাচার্যের মাটির মূর্তি তৈরি করে, সেই মূর্তির সামনে বসে নিজে নিজে অস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস করতে লাগলেন। অস্ত্র-গুরু দ্রোণাচার্য তাঁকে শিক্ষা দিতে

চাননি বলেই তাঁর একাগ্রতা ও নিষ্ঠা দ্বিগুণ হয়ে উঠল এবং দিনের পর দিন তিনি একাগ্রতার সঙ্গে অস্ত্রশিক্ষা আয়ত্ত করতে লাগলেন।

একদিন পাণ্ডব ও কৌরবরা দ্রোণাচার্যের নির্দেশে মৃগয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছেন। দ্রোণাচার্যের উদ্দেশ্য ছিল—এই মৃগয়ায় নিজে গিয়ে তিনি তাঁর ছাত্রদের পরীক্ষা নেবেন। পরীক্ষার সুবিধার জন্য একটি কুকুর ও একটি মৃগ সঙ্গে নেওয়া হ'ল। পাণ্ডব ও কৌরবরা যখন বনে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখন সেই কুকুরটি মৃগকে অনুসরণ করে একলব্যের কাছে গিয়ে উপস্থিত। একলব্য তখন আপনমনে দ্রোণাচার্যের মূর্তির সামনে বসে ধনুর্বিদ্যা অভ্যাস করছেন। কুকুরটি একলব্যের মলিন বেশ দেখে, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার সুরু করে দিল।

কুকুরের চীৎকারে একলব্যের একাগ্রতা নষ্ট হতে চলেছে। তাই কুকুরের চীৎকার বন্ধ করার জন্য একলব্য তার মুখে এক সঙ্গে কয়েকটি শর নিক্ষেপ ক'রে তার মুখ বন্ধ করে দিলেন। অথচ, কুকুরটির কোন ক্ষতি হ'ল না।

কুকুরটি সেই অবস্থায় পাণ্ডবদের কাছে গিয়ে উপস্থিত। অর্জুন কুকুরের অবস্থা দেখে মনে মনে ভাবলেন—কে এমন ধনুর্ধর আছেন, যিনি এত সুন্দরভাবে ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষা দিতে পেরেছেন। আশ্চর্য তাঁর শিক্ষা। অর্জুনও তো এখনো এইরূপ শিক্ষা আয়ত্ত করতে পারেন নি। তখন পাণ্ডবরা বনে বনে সেই ব্যক্তির অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা গিয়ে একলব্যের কাছে উপস্থিত হলেন। অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে একলব্য নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি নিষাদ অধিপতি হিরণ্যধনুর পুত্র এবং দ্রোণাচার্যের শিষ্য। এখানে ধনুর্বেদ অনুশীলন করি। অর্জুন তাঁর ধনুর্বিদ্যা শিক্ষার আয়োজন দেখে তো বিস্ময়ে হতবাক্!

অর্জুন তখন মহর্ষি দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে সব কথা জানালেন। দ্রোণাচার্য কথা শুনে খুব অবাক হলেন। অর্জুন বললেন, আপনি বলেছিলেন, আমার মত ধনুর্ধর আর দ্বিতীয় নেই ; কিন্তু এখন দেখছি,

এই নিষাদ-পুত্রই আপনার শ্রেষ্ঠ শিষ্য। তখন দ্রোণাচার্য অর্জুনকে নিয়ে একলব্যের কাছে গেলেন।

দ্রোণাচার্য সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, এক মলিন বেশধারী বালক শরাসন আকর্ষণ করে বারংবার তীর নিক্ষেপ করছেন। কি একাগ্রতা তাঁর সেই তীর-ক্ষেপণে। দ্রোণাচার্যের একটি মূর্তি তাঁর সামনে। মাঝে মাঝে সেই মূর্তির সামনে গিয়ে বালক আপনমনে কথা বলছেন। দ্রোণাচার্য সে দৃশ্য দেখে বিস্মিত হলেন। দ্রোণাচার্যকে দেখে একলব্য আনন্দে অধীর হয়ে গুরুকে প্রণাম করলেন। যে গুরু একদিন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, আজ তিনি নিজেই উপস্থিত। কি আনন্দ আজ একলব্যের !

শিষ্যের প্রণাম গ্রহণ করে দ্রোণাচার্য বললেন, একলব্য ! তোমার শিক্ষায় আমি সন্তুষ্ট। তুমি আমাকে গুরু মনে করে যাবতীয় শিক্ষা গ্রহণ করেছ। তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে চলেছে। এখন তুমি আমাকে গুরুদক্ষিণা দাও। একলব্য আনন্দে অধীর হয়ে বললেন, প্রভু ! আপনি যা দক্ষিণা চাইবেন, আমি তাই দেব। বলুন প্রভু ! আমি কি দক্ষিণা দেব ?

দ্রোণাচার্য একবার অর্জুনের দিকে তাকালেন। পরক্ষণে তিনি বললেন, তোমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি আমাকে দক্ষিণা দাও। গুরুকে একলব্যের অদেয় কিছুই নেই। গুরু যা চেয়েছেন, তা দিতেই হবে। তৎক্ষণাৎ একলব্য তাঁর ডানহাতের বুড়ো আঙুলটি কেটে গুরুর পায়ে উপহার দিলেন।

অর্জুন এই দৃশ্য দেখে খুব পুলকিত হলেন। ডান হাতের বুড়ো আঙুলই ধনুর্বিদ্যা শেখার প্রধান অবলম্বন। একলব্যের এই আঙুলটি বাদ যাওয়ায়, তাঁর আর শ্রেষ্ঠত্ব লাভের সম্ভাবনা নেই। এখন অর্জুনের চেয়ে আর বড় কোন ধনুর্ধর নেই। অর্জুনের মনে আর কোন দুশ্চিন্তা রইল না।

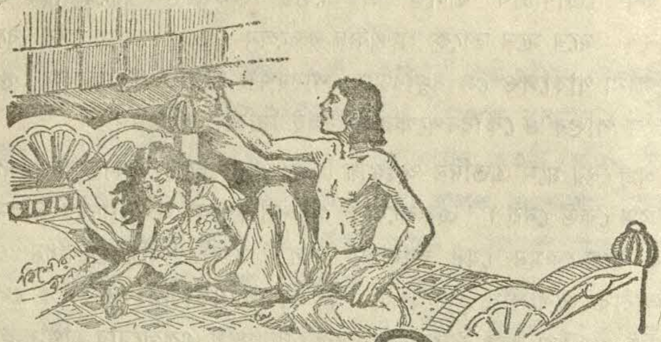
গুরু দ্রোণাচার্য বালক একলব্যের গুরুভক্তি দেখে পরম প্রীত হ'লেন। মনে মনে তাকে আশীর্বাদ করলেন—তার ডানহাতের বুড়ো আঙুল না থাকলেও সে ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হবে। একলব্যের গুরুভক্তিতে পাণ্ডব ও কৌরবপক্ষের সকলেই বিস্মিত হ'লেন।

অর্জুনের মনে এতদিন অহঙ্কার ছিল, তাঁর চেয়ে লক্ষ্যভেদে নিপুণ আর বড় কেউ নেই। একলব্যের গুরু-দক্ষিণায় ও ত্যাগের মহিমায় তাঁরও মনে কেমন যেন ভাবান্তর এল। কৌরব-বীর দুর্যোধন তো একলব্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। একলব্যের একাগ্রতা ও ত্যাগ দেখে সকলেই ধন্য ধন্য করে উঠলেন। গুরু দ্রোণাচার্য একলব্যের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

নিষাদ-বীর একলব্যের শিক্ষা গুরুর আশীর্বাদে সফল হ'ল।

গুরুভক্তি একাগ্রতা শিষ্যের লক্ষণ।
একলব্য পাইল এবে গুরুর চরণ ॥

—— ——



বেহুলা ও লক্ষীন্দর

মনসা শিবের মানসকন্যা। পদ্মপাতায় তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে, তাঁর অপর নাম পদ্মা। জন্মের পর মনসা পাতালে আশ্রয় নেন এবং সর্প-কুলের দেবী হিসেবে তিনি স্বীকৃতি পান। পরে শিব তাঁকে কৈলাসে আনলেন। কৈলাসে বিমাতা চণ্ডীর কোপে তাঁর এক চোখ কানা হয়ে যায়।

মনসার সঙ্গে জরৎকারু মুনির বিবাহ হয়। পাছে বিমাতার কোপে সংসারে অশান্তি হয়, তাই শিব তাঁকে সিঁজুয়া পর্বতে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে গিয়ে মনসা সহচরী নেতার সাহায্যে মর্ত্যে তাঁর পূজা প্রচলন করবার জন্য সচেষ্ট হলেন। মনসা পিতা শিবকে এ-বিষয়ে সাহায্য করতে বললেন। শিব বললেন, চম্পকনগরের চাঁদ সদাগর যদি তোমার পূজা করেন, তবেই মর্ত্যে তোমার পূজার প্রচলন হবে।

চাঁদ সদাগর পরম শৈব। তিনি শিব ছাড়া আর কোন দেবতার পূজা করতে নারাজ। অনেক অনুনয়েও চাঁদ সদাগর মনসার পূজা করতে রাজী না হওয়ার জন্য মনসার সঙ্গে চাঁদের বিবাদ তীব্র আকার ধারণ করল। মনসা একে একে চাঁদের সুন্দর বাগান নষ্ট করলেন, তাঁর অলৌকিক শক্তি মহাজ্ঞান হরণ করে নিলেন এবং শেষ পর্যন্ত

চাঁদের ছয় পুত্রকে সাপ দিয়ে কামড়িয়ে মেরে ফেলে, তাঁর প্রতিশোধ চরিতার্থ করলেন। চাঁদ কিন্তু সমূহ বিপদে অটল। এত বিপদ সত্ত্বেও কিছুতেই তিনি মনসার পূজা করতে রাজী হলেন না।

পুত্রশোক ভোলবার জন্য চাঁদ সদাগর চৌদ্দ ডিঙা সাজিয়ে বাণিজ্যে গেলেন। মনসার চক্রান্তে কালীদহে ভীষণ ঝড় উঠল—একে একে চাঁদের সমস্ত ডিঙা কালীদহের জলে ডুবে গেল। প্রাণমাত্র সম্বল করে নিঃস্ব হয়ে, চাঁদ ঘরে ফিরলেন।

অনেকদিন পরে চাঁদ সদাগরের আর একটি পুত্র জন্মাল। চাঁদ তাঁর নাম দিলেন লক্ষীন্দর। লক্ষীন্দরের বিবাহের বয়স হ'লে, চাঁদ ঘটা করে তাঁর বিবাহের উদ্যোগ করলেন। উজানী নগরের সায়বেনের কন্যা বেহুলার সঙ্গে লক্ষীন্দরের বিবাহ হ'ল। মনসা যাতে কোন বিপত্তি সৃষ্টি করতে না পারেন, এই ভেবে চাঁদ সদাগর সাঁতালী পর্বতে লোহার বাসরঘর নির্মাণ করালেন। কিন্তু দৈবের নির্বন্ধে কালনাগিনী সেই বাসরঘরের এক ছিদ্র দিয়ে ঢুকে নিদ্রারত অবস্থায় লক্ষীন্দরকে দংশন করল। লক্ষীন্দর তখন দংশনের জ্বালায় চীৎকার করে উঠল—

শুনো ওগো বেহুলা সায়বেনের ঝি।
তোর হইল কাল নিদ্রা, মোরে খাইল কি?

লক্ষীন্দরের মৃত্যু ঘটল। সারা চম্পকনগর আর্তনাদে ধ্বনিত হয়ে উঠল। লক্ষীন্দরকে সর্প দংশন করেছে; তাঁর দেহে আর প্রাণ নেই। শোকে-ক্রোধে চাঁদ সদাগর গর্জন করে উঠলেন, মা সনকা ঘনঘন মূর্ছা যেতে লাগলেন। কিন্তু সতী বেহুলা এ বিপদে আত্মহারা হলেন না।

বেহুলা দৃঢ় সঙ্কল্পে বুক বেঁধে, স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে কলার ভেলায় ভেসে চললেন। যে প্রকারেই হোক, তিনি তাঁর স্বামীকে বাঁচাবেনই। মা, ভাই, শ্বশুর-শাশুড়ী সকলের করুণ মিনতি উপেক্ষা করে বেহুলা মৃত স্বামীর দেহ কোলে নিয়ে নদীর জলে ভেসে চললেন।

পথে কত প্রলোভন, কত ভীতি। তবু, বেহুলা তাঁর সঙ্কল্পে অটল। তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা তাঁর মৃত স্বামীকে বাঁচাতেই হবে। নদীর

এক ঘাটে গোদা মাছ ধরছিল—বেহুলাকে দেখে সে আকুল হয়ে উঠল। শঙ্খ সদাগর বাণিজ্যতরী থেকে বেহুলাকে দেখেই পাগলের মত হয়ে উঠল। মড়া ফেলে দিয়ে বেহুলাকে তাদের সঙ্গে আসবার জন্য কত ক'রে বুঝাল। কিন্তু বেহুলা তাঁর নিষ্ঠায় অটল। মনসাও নানা রূপ ধরে বেহুলাকে ভয় দেখালেন। কিন্তু কোন কিছুতেই বেহুলাকে টলানো গেল না।

কলার ভেলা ধীরে ধীরে পচতে শুরু করলে—সেই সঙ্গে লক্ষীন্দরের সুন্দর দেহ গলে কঙ্কালে পরিণত হল। সেই কঙ্কালকেই কোলে নিয়ে, সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করে, ছ' মাস পরে বেহুলা এলেন ত্রিবেণীর ঘাটে। সেখানে গিয়ে বেহুলা এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখলেন। এক ধোপানী ঘাটে কাপড় কাচতে এসে, তার ছেলেকে পাটে আছড়ে মেরে ফেললে; আবার সন্ধ্যাবেলা তাকে বাঁচিয়ে বাড়ী নিয়ে গেল। বেহুলা তাকে ধরে বসলেন, তাঁর মৃত স্বামীকেও বাঁচিয়ে দিতে হবে। এই ধোপানী মনসার সহচরী নেতাই। নেতাই তাঁকে পরামর্শ দিল—স্বর্গে গিয়ে দেবসভায় নাচ-গান করে দেবতাদের তুষ্ট করতে; তাহলে হয়তো, তাঁর মরা স্বামীর জীবন ফিরে পাওয়া যাবে।

শেষ পর্যন্ত নেতাই-এর সঙ্গে বেহুলা স্বর্গলোকে গেলেন এবং দেবতাদের সভায় নাচ-গান করলেন। দেবতারা তাতে তুষ্ট হ'য়ে মনসাকে লক্ষীন্দরের প্রাণদানের অনুরোধ করলেন। বেহুলা তাঁর শ্বশুর চাঁদ সদাগরকে দিয়ে মনসার পূজা করাবেন—এই সর্তে মনসা লক্ষীন্দর ও তাঁর ছয় ভাই-এর প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন—নদীতে ডুবে-যাওয়া ডিঙা ও ধনদৌলত উদ্ধার করে দিলেন। স্বামী ও ছয় ভাসুর এবং সব বাণিজ্যতরী নিয়ে বেহুলা এবার দেশে ফিরলেন।

চৌদ্দ ডিঙা এসে চম্পকনগরের ঘাটে লাগল। বেহুলা ডিঙায় বসে বললেন, যদি তাঁর শ্বশুর মনসার পূজা করেন, তবে তাঁরা ডিঙা থেকে নামবেন। হাতের কাছে হারানো সম্পদ—মনসার পূজা করলেই চাঁদ সদাগর সব ফিরে পাবেন। তথাপি চাঁদ বলে উঠলেন—

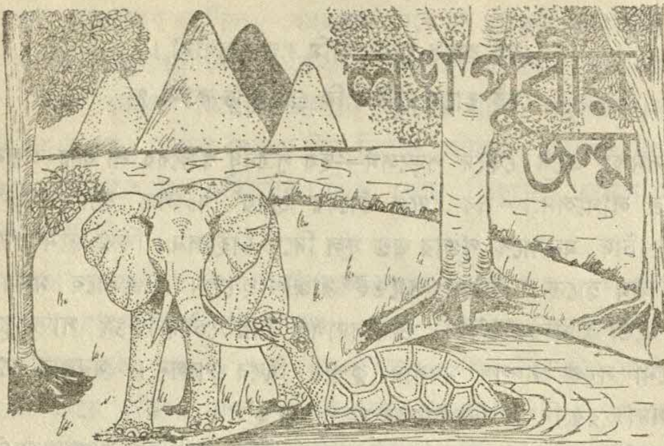
যেই হাতে পূজি আমি শঙ্কর ভবানী।
সেই হাতে পূজিব কি চেঙমুড়ি কানী ?

সনকা এসে কেঁদে পড়লেন—ছয় পুত্রবধূ শ্বশুরের পা ধরে অনুনয় করতে লাগলেন। সব দেখে চাঁদের হৃদয় বিচলিত হয়ে পড়ল। এবার চাঁদ মনসাকে পূজার জন্য ফুল দিতে চাইলেন ; কিন্তু ডান হাতে নয়—বাম হাতে। মনসা তাতেই রাজী হ'লেন। এভাবে মনসার পূজা মর্ত্যে প্রচারিত হ'ল। চাঁদ সদাগর তাঁর চৌদ্দ ডিঙা, সাত পুত্র, হারানো সমস্ত সম্পদ মনসার কৃপায় ফিরে পেলেন। মনসার সঙ্গে চাঁদ সদাগরের বিবাদ চিরকালের মতো বন্ধ হ'ল।

মর্ত্যের ঘরে ঘরে সাপের দেবী মনসার পূজা প্রচলিত হ'ল। স্বর্গের দেবতাগণও সন্তুষ্ট হলেন। এদিকে লক্ষীন্দর ও বেহুলা দীর্ঘজীবন সংসারে বাস করে শেষে স্বর্গে ফিরে গেলেন।

চাঁদ করে ভক্তি-ভরে মনসা-পূজন।
মনসা-মাহাত্ম্য কথা শুনে সর্বজন॥

———



পূর্বকালে সন্তাপন নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র—সুপ্রতাপ ও বিভাস। সন্তাপন বহু অর্থ রেখে অকালে মারা গেলেন। মৃত্যুর সময় সন্তাপন এই অর্থ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুপ্রতাপের কাছে গচ্ছিত রেখে যান। কোনরূপ ভাগ করে যাননি কিংবা এ সম্বন্ধে কাকেও কিছু বলে যাননি।

অর্থের ভাগ নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হ'ল। কনিষ্ঠ ভাই তখন এর মীমাংসার জন্য শাস্ত্রজ্ঞ বশিষ্ঠ মুনির কাছে গেল। বশিষ্ঠ মুনি শাস্ত্র বিচার করে রায় দিলেন, এক্ষেত্রে অন্ততঃ দুই-পঞ্চমাংশ অর্থ কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রাপ্য। কিন্তু কেউ সে কথা শুনতে চাইল না। ফলে তাদের মধ্যে ঝগড়া সুরু হ'ল। তখন দুভাই দুজনকে অভিশাপ দিতে লাগল। পরস্পরের অভিশাপের ফলে এক ভাই হ'ল হাতী; আর এক ভাই হ'ল কচ্ছপ। গজ-কচ্ছপ হ'ল দুই ভাই। হাতী বনে থাকে আর কচ্ছপ থাকে সরোবরে।

একদিন হাতী গেল সরোবরে জল খেতে; তা দেখে কচ্ছপ তার প্রতিশোধ নেবার জন্য হাতির শুঁড় ধরে টানতে সুরু করল। দুজনেরই সমান শক্তি—কেউ কাউকে পরাজিত করতে পারছে না। এক বছর ধরে এভাবে দুজনের লড়াই চলল। এমন সময় বিনতা-নন্দন গরুড় অন্তরীক্ষ দিয়ে যেতে যেতে সেই গজ ও কচ্ছপের যুদ্ধের দৃশ্য দেখতে

পেলেন। যুদ্ধ করতে করতে গজ কাতর হ'য়ে নারায়ণকে ডাকতে লাগল। তা দেখে বিনতা-নন্দন গরুড়ের মনে দয়া হ'ল ; গরুড় তখন বাঁ পায়ের নখ দিয়ে দুজনকেই শূন্যে তুলে নিলেন। উড়তে উড়তে গরুড় ক্লান্ত হয়ে এক বিরাট বটগাছের উপর গজ-কচ্ছপ নিয়ে বসলেন। গজ-কচ্ছপ ও গরুড়ের ভার সহ্য করতে না পেরে গাছের ডাল ভেঙে পড়তে সুরু করল। ঐ বিরাট গাছের তলায় মুনি-ঋষিরা তপস্যা করতেন। তাঁদের ক্ষতি হবে—এই ভেবে গরুড় তাঁর ডান পায়ের নখ দিয়ে গাছের ডাল শূন্যে ধরে রাখলেন।

এবার গরুড় ডালসমেত গজ-কচ্ছপ নিয়ে ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হ'লেন। ব্রহ্মার আদেশ পেয়ে গরুড় গজ-কচ্ছপ দুটোকেই খেয়ে ফেলতে উদ্যত হলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে সুমেরু পর্বতের উপর এসে বসলেন। এদিকে পবন দেবতা রাগে ধেয়ে এলেন—তিনি কিছুতেই গরুড়কে গজ-কচ্ছপ খাবার জন্য পর্বতের ওপর বসতে দেবেন না।

পবনদেবতা গরুড়ের উপর রেগে ঝড়ের বেগে সুমেরু পর্বতকে উড়িয়ে দিতে উদ্যত হলেন ; আর গরুড় পাখা ঢাকা দিয়ে সুমেরু পর্বতকে ঝড়ের প্রকোপ থেকে বাঁচাতে চাইলেন।

পবনদেবতা সাতদিন ধরে সুমেরু পর্বতের উপর ভয়ঙ্কর শিলা-বৃষ্টি করলেন ; কিন্তু গরুড় তাঁর সুবিশাল পাখা ঢাকা দিয়ে পর্বতকে রক্ষা করলেন। পবন ও গরুড়ের এই রেষারেষিতে প্রলয় উপস্থিত হ'ল ; দেবতাগণ প্রলয়ের হাতে থেকে পৃথিবীকে বাঁচাবার জন্য ব্রহ্মার দ্বারস্থ হলেন। ব্রহ্মা দেবতাদের কাছে সব শুনে দ্রুত সুমেরু পর্বতে চলে গেলেন। সেখানে তিনি পবনকে প্রথমে যুদ্ধে নিরস্ত হতে বললেন, কিন্তু রাগে পবনদেবতা কোন কথাই শুনলেন না। ব্রহ্মা পবনের প্রতি বিরক্ত হয়ে গরুড়কে বললেন, আমি সৃষ্টি করেছি, তাকে তুমি রক্ষা কর ; তাকে ধ্বংস করতে দিও না। তার চেয়ে বরং পর্বতের একদিক থেকে তুমি পাখা তুলে নাও ; তাতে পবনের বেগ কিছুটা প্রশমিত হবে।

ব্রহ্মার আদেশ শিরোধার্য করে গরুড় তখন পর্বতের একদিক থেকে পাখা তুলে নিলেন। অকস্মাৎ বিকট শব্দে সুমেরু পর্বত নড়ে উঠল এবং প্রবল ঝড়ে সুমেরু পর্বতের শৃঙ্গ ভেঙে পড়ল। পবন তখন খুব রেগে গেছেন; তিনি তাঁর শক্তি ও প্রচণ্ড বেগ দেখানোর জন্য ব্যগ্র। কিছুতেই তিনি গরুড়ের কাছে হার মানবেন না।

সুমেরু পর্বতের শৃঙ্গ পবনের প্রচণ্ড বেগে দক্ষিণ দিকে ধেয়ে চলল। দক্ষিণ দিকে প্রকাণ্ড সমুদ্র; সেই সমুদ্রে আছেন বরুণ দেবতা। বরুণ সমুদ্রের মধ্যে রেখেছেন চিত্রকুট পর্বত। সমুদ্রের জলের মধ্যে সেই অতিকায় চিত্রকুট পর্বতের উপর গিয়ে পড়ল সুমেরু পর্বতের শৃঙ্গ।

চিত্রকুট পর্বতের উপর সুমেরু পর্বতের শৃঙ্গ পড়ায় মহাসমুদ্রের মাঝখানে নতুন এক দ্বীপ সৃষ্টি হ'ল। অপূর্ব সেই দ্বীপের শোভা; যেন স্বর্ণপুরীর মতই। এত সুন্দর স্থান শূন্য পড়ে থাকবে—তা তো আর হয় না। দেবতারা ব্রহ্মাকে গিয়ে ধরলেন, ওখানে কিছু সৃষ্টি করার জন্য। ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে সেখানে এক নতুন পুরী তৈরি করতে বললেন।

এদিকে ব্রহ্মার আদেশ রাক্ষসরা শুনে ফেলেছে। তারা সেই নতুন পুরী অধিকার করার জন্য নিজেরাই বিশ্বকর্মার কাছে গিয়ে উপস্থিত। বিশ্বকর্মাকে তারা জোর করে সেখানে হেমপুরী সৃষ্টি করতে ধরে নিয়ে এল। তাঁকে সোনায় মুড়ে দিতে হবে সমস্ত পুরীটাকে।

দীর্ঘদিনের প্রয়াসে এবং বিশ্বকর্মার অপূর্ব সৃষ্টি-প্রতিভায় সেখানে নতুন পুরী নির্মিত হ'ল—এই পুরীর নাম হ'ল লঙ্কাপুরী। শত শত পুষ্পবন, সুরম্য হর্ম্যরাজি এবং মনোহর সরোবর সেখানে তৈরী হ'ল। বিশাল প্রাচীর-বেষ্টিত এক রাজপ্রাসাদও নির্মিত হ'ল। প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে সোনার কপাট শোভিত হ'ল। প্রাচীরের চারপাশে বড় বড় দরজা—যাতে বাইরের কোন শত্রু ঢুকে পড়তে না পারে। সবদিকে উপযুক্ত প্রহরীর ব্যবস্থা। পুরীর বাইরে চারদিকে বিরাট সমুদ্র; আর সেই সমুদ্রের মাঝখানে লঙ্কাপুরী—সোনার লঙ্কাপুরী।

লঙ্কাপুরীর অপূর্ব সৌন্দর্য ও বিপুল ঐশ্বর্যরাশি দেখে রাক্ষসরা লঙ্কাপুরী অধিকার করে নিতে চাইল। দেবতারা হার মানলেন রাক্ষসদের কাছে। অবশেষে লঙ্কাপুরী রাক্ষসদের অধিকারে এল। রাক্ষসদের রাজা হলেন রাবণ। এই লঙ্কাপুরীতেই রামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল। চোদ্দ যুগ রাজত্ব করার পর লঙ্কার রাজা রাবণের মৃত্যু হয় ত্রেতাযুগের অবতার ভগবান রামচন্দ্রের হাতে।

রামায়ণে সেই কাহিনী সুন্দরভাবে লেখা আছে।

বিশ্বকর্মা নির্মাইল পুরী মনোহর।
লঙ্কা নামে খ্যাত ইহা ভুবন ভিতর ॥



কালকেতু ও ফুল্লরা

শিবের পত্নী চণ্ডী। সকলের পূজা হ'চ্ছে দেখে তিনি চাইলেন মর্ত্যে যেন তাঁরও পূজা হয়। তাঁর পূজার প্রচার করতে স্বর্গের কোন দেবতাকে অভিশাপ দিয়ে মর্ত্যে পাঠাতে হবে। কিন্তু কাকে পাঠানো যায়। অথচ অভিশাপ দিয়ে কাউকে মর্ত্যে না পাঠালে তো চণ্ডীর পূজার প্রচার হবে না। নীলাম্বর শিবের ভক্ত; নিত্য শিবপূজা করেন। তাই চণ্ডী শিবের কাছে ধরে বসলেন নীলাম্বরকে অভিশাপ দিয়ে মর্ত্যে পাঠাতে। অহেতুক নীলাম্বরকে শাপ দিতে শিব কিছুতেই রাজী হলেন না।

তখন দেবী চণ্ডী এক ছলনার আশ্রয় নিলেন। নীলাম্বর শিবপূজার জন্য ধুতুরা ফুল তুলতে গেলেন। দেবী সেই ফুলে কীট হয়ে লুকিয়ে রইলেন। পরে শিবের পূজার সময় কীটরূপিনী দেবী শিবকে দংশন করলেন। শিব যন্ত্রণায় কাতর হ'য়ে নীলাম্বরকে মর্ত্যে ব্যাধ হয়ে জন্মানোর জন্য অভিশাপ দিলেন।

নীলাম্বর মর্ত্যে ধর্মকেতু ব্যাধের পুত্র কালকেতু হয়ে জন্মালেন। তাঁর পত্নী ছায়াও স্বামীকে অনুসরণ করে সঞ্জয়কেতু ব্যাধের কন্যারূপে জন্মালেন। তার নাম হ'ল ফুল্লরা।

কালকেতুর যেমন রূপ, তেমনই গুণ। তাঁর হাত দুটি লোহার

মত শক্ত, বুক বিশাল, চোখ কান পর্যন্ত টানা। ব্যাধের ছেলে কালকেতু—বাবার সঙ্গে বনে শিকারে যান। তাঁর শিকার অব্যর্থ। ছেলের বিক্রম দেখে ধর্মকেতু ব্যাধ কালকেতুর বিবাহের উদ্যোগ করলেন। ফুল্লরার সঙ্গে কালকেতুর বিবাহ হল। নীলাম্বর ও ছায়া এভাবে পুনর্মিলিত হলেন।

পিতার মৃত্যুর পর কালকেতু প্রত্যহ শিকারে যান, তাঁর ভয়ে বনের সব পশু ভীত; কখন কে যে কালকেতুর হাতে মারা পড়বে, তার ঠিকানা নেই। তারা সবাই মিলে দেবী চণ্ডীর কাছে নালিশ জানাল। চণ্ডীও তাদের অভয় দিলেন।

এদিকে চণ্ডী সোনালী গোসাপের রূপ ধরে কালকেতুর শিকারের পথে শুয়ে রইলেন। সেদিন আর কোন শিকার জুটল না বলে কালকেতু তাকেই বেঁধে নিয়ে গেল। সেই গোসাপ কালকেতুর বাড়ীতে গিয়ে এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে হয়ে বসে রইল। তা দেখে কালকেতুর স্ত্রী ফুল্লরা তো অবাক। ফুল্লরা এই রূপসী মেয়েকে দেখে ভাবলেন, কালকেতু বুঝি ঘরে আর একটা নতুন বউ এনেছেন। তিনি তখন মেয়েটিকে তাঁদের দুঃখময় জীবনের কথা বলে ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন। মেয়েটিও কিছুতেই যেতে চান না। তখন তিনি কালকেতুর কাছে গিয়ে কাঁদতে লাগলেন। রাগে কালকেতু ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে কুঠার দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হলেন। শেষ পর্যন্ত চণ্ডী নিজরূপ ধারণ করে কালকেতু ও ফুল্লরাকে বর দিলেন।

দেবীর বরে কালকেতু একটি হীরের আংটি ও সাত কলসী সোনার টাকা পেলেন। সেই আংটির বিনিময়ে টাকা নিতে গিয়ে ধূর্ত বেনে মুরারী শীল তাকে ঠকালো; কিন্তু শেষ পর্যন্ত চণ্ডীর ভয়ে তাঁর পুরো টাকা মিটিয়ে দিয়ে গেল।

এবার কালকেতু গুজরাটে এক সুন্দর নগর তৈরি করলেন। কিন্তু সেখানে বাস করার কোন লোক নেই। তখন চণ্ডী ভয়ঙ্কর বন্যা সৃষ্টি করলেন। সেই বন্যায় যাদের ঘরবাড়ী ভেসে গেল, তারা এই নতুন নগরে বাস করতে এল। গুজরাট নগর ধন-জনে পূর্ণ হয়ে গেল।

এই সময় ভাঁড়ু দত্ত নামে এক ধূর্ত লোক কালকেতুর সঙ্গে খুব ভাব জমাল। কালকেতু তার প্রকৃতি বুঝতে না পেরে, তার উপর নগরের শাসনভার দিলেন। ভাঁড়ু দত্ত এই সুযোগে মিথ্যা কথা বলে জবরদস্তি করে অনেককে ঠকাতে সুরু করল। সবাই ভাঁড়ুর নামে কালকেতুর কাছে গিয়ে নালিশ করায়, শেষ পর্যন্ত কালকেতু তাকে তাঁর রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

এদিকে ভাঁড়ু দত্ত অপমানের জ্বালায় কালকেতুর বিরুদ্ধে কলিঙ্গ-রাজের কাছে নানা মিথ্যা অভিযোগ করল। এর ফলে কালকেতুর সঙ্গে কলিঙ্গরাজার প্রবল যুদ্ধ হ'ল। সেই যুদ্ধে কালকেতু তাঁর নিশ্চিত পরাজয় দেখে ভাঁড়ুর কাছে পরামর্শ চাইল, এখন কি উপায়। ভাঁড়ু তাঁকে তখন পরামর্শ দিয়ে ধানের গোলায় লুকিয়ে থাকতে বলল। এদিকে ভাঁড়ুর কাছ থেকে জানতে পেরে কলিঙ্গরাজের লোকজন তাঁকে ধানের গোলার ভেতর থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করল।

কালকেতু বন্দী হয়ে কারাগারে চণ্ডীর প্রার্থনা করে অনুনয় করে কাঁদতে থাকেন। ভক্তের এই দশা দেখে চণ্ডীর মনে দয়া হ'ল। চণ্ডী তখন কলিঙ্গরাজকে স্বপ্নে ভয় দেখিয়ে বললেন, কালকেতু আমার ভক্ত। তাকে ছেড়ে দাও, নইলে তোমার ভীষণ বিপদ হবে। পরদিন সকালে কলিঙ্গরাজ কালকেতুকে মুক্তি দিয়ে যথোচিত সমাদর করলেন। কলিঙ্গ-রাজ কালকেতু ও ফুল্লরাকে দেবীর আশ্রিত জেনে তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন।

এবার কালকেতু নিজ রাজ্যে ফিরে এসে ভক্তিভরে দেবী চণ্ডীর পূজা করায় মর্ত্যধামে চণ্ডীর পূজা প্রচারিত হ'ল।

দেবী চণ্ডী পূজা পেয়ে সন্তুষ্ট হলেন।

কালকেতু-ফুল্লরা করে চণ্ডীর পূজন।
মঙ্গল চণ্ডীর গীতে ক'রে জাগরণ॥

———



গৌড়েশ্বরের এক সামন্ত রাজার নাম কর্ণসেন। ইছাই ঘোষ নামে এক বিদ্রোহী প্রজার সঙ্গে তাঁর একবার যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে রাজার ছয় পুত্র মারা গেলেন। পুত্রশোকে রানীও মারা গেলেন। মনের দুঃখে রাজার দিন কাটে। শেষে বৃদ্ধ বয়সে রাজা আর একটি বিয়ে করলেন; নতুন রানীর নাম রঞ্জাবতী।

রঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরের কৃপায় একটি পুত্র লাভ করলেন। পুত্রের নাম লাউসেন। লাউসেন রূপে গুণে যেমন অতুলনীয়, তেমনি বুদ্ধিমান ও বলশালী। লাউসেনের মামা মহামদ তাঁকে সুনজরে দেখতে পারতেন না। তাই কেবলই ফন্দী আঁটতে লাগলেন—লাউসেনকে কিভাবে জব্দ করা যায়। অনেক ফন্দী করেও কিন্তু কোন রকমে লাউসেনের ক্ষতি করতে পারলেন না। এরপর কর্ণসেনের কাছে মহামদ পরামর্শ দিলেন যে লাউসেনকে গৌড়ের রাজার কাছে পাঠালে লাউসেনের নামযশ খুব বেড়ে যাবে। কর্ণসেন তখন তাঁর পুত্র লাউসেনকে গৌড়রাজার দরবারে পাঠাতে মনস্থ করলেন। এদিকে তাঁর মামা চক্রান্ত করলেন, যাতে গৌড়ে যাওয়ার পথে লাউসেনকে হত্যা করা যায়।

লাউসেন তাঁর ছোট ভাই কর্পূরধবলকে সঙ্গে নিয়ে গৌড়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। সেই পথে বিরাট এক জঙ্গল। সেখানে লাউসেনের পথ আটকে রইল এক বাঘ! ধর্মঠাকুরের কৃপায় লাউসেন বাঘকে মারলেন। এরপর পড়ল তারাদীঘি; এই বড় দীঘি পেরিয়ে লাউসেনকে গৌড়ে যেতে হবে। সেই দীঘিতে ছিল বিরাট এক কুমীর। ধর্মঠাকুরের নাম করে লাউসেন সেই কুমীরকেও মারলেন। এমনি আরও বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত লাউসেন গৌড় এসে পৌঁছুলেন। গৌড়ের রাজার কাছে নিজের বাহুবল দেখিয়ে লাউসেন সকলের খ্যাতি অর্জন করলেন। লাউসেনের মামার সব চক্রান্ত ব্যর্থ হ'ল। দেশে ফেরার পথে কালুডোম ও তার স্ত্রী লখাইডোমের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব হ'ল। তাদের বীরত্বের পরিচয় পেয়ে, তাদের সঙ্গে নিয়ে লাউসেন দেশে ফিরে দক্ষিণে ময়নাগড়ে এক নতুন রাজ্য স্থাপন করলেন।

কিছুকাল পরে গৌড়ের রাজার কাছ থেকে নির্দেশ এল, লাউসেনকে যেতে হবে কামরূপের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে। লাউসেন বুঝতে পারলেন, এ-ও তাঁর মামারই চক্রান্ত। কিন্তু বীর লাউসেন পিছু হট্‌বার লোক নন। তিনি কালুডোম ও তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে কামরূপের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চললেন। দু-দলে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হ'ল। সেই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত কামরূপের রাজা পরাজিত হলেন। কামরূপের রাজকন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ করে লাউসেন দেশে ফিরলেন। দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই আবার নির্দেশ পেলেন, তাঁকে ঢেকুরগড়ের রাজা ইচ্ছাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যেতে হবে। দেশে ফিরে একটুও বিশ্রাম নেবার উপায় নেই। লাউসেন তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে আবার চললেন যুদ্ধে। অজয় নদীর তীরে দুপক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হ'ল। ধর্মঠাকুরের কৃপায় লাউসেন বিজয়ী হলেন।

সিমুলের রাজা হরিপালের কন্যা কানাড়া ঘোষণা করলেন—কোন বীর যদি এককোপে তাঁর লোহার তৈরী গণ্ডারের মাথা কেটে

ফেলতে পারেন, তবে তিনি তাঁকে বিয়ে করবেন। যিনি এককোপে কাটতে পারবেন না তাঁকে যাবজ্জীবন বন্দী থাকতে হবে।

লাউসেনের মামার চক্রান্তে গৌড়ের রাজা লাউসেনকে সেইখানে পাঠালেন। গৌড়েশ্বরের আদেশ অমান্য করা যায় না। তাই লাউসেন সদলবলে চললেন সিমুলের পথে। সেখানে তিনি ধর্মঠাকুরের কৃপায় এককোপে সেই লোহার গণ্ডারের মাথা কেটে ফেললেন। সিমুলের রাজা লাউসেনের বাহুবলের পরিচয় পেয়ে তাঁর সঙ্গে কানাড়ার বিবাহ দিলেন।

এতেও কিন্তু লাউসেনের নিস্তার নেই। তাঁকে আরও বড় বিপদে পড়তে হ'ল। তাঁকে বলা হ'ল, পশ্চিমদিকে সূর্যোদয় দেখাতে হবে; নতুবা তাঁর পিতামাতাকে হত্যা করা হবে। পশ্চিমদিকে সূর্য অস্ত যায়; কি করে সেদিকে সূর্যোদয় দেখানো যাবে! বিষম সমস্যায় পড়লেন লাউসেন। অগত্যা লাউসেন ধর্মের পীঠস্থান হাকন্দে গিয়ে ধর্মঠাকুরের তপস্যা করতে শুরু করলেন। ধর্মঠাকুরের কৃপায় শেষ পর্যন্ত লাউসেন অসাধ্য সাধন করলেন—পশ্চিমে সূর্যোদয়ও দেখালেন।

এদিকে লাউসেনের অনুপস্থিতিতে, তাঁর মামার চক্রান্তে একদল লোক ময়নাগড় আক্রমণ করল। কালুডোমের উপর ময়নাগড় রক্ষা করবার ভার ছিল। কিন্তু কালুডোম শত্রুপক্ষের কাছ থেকে টাকা-পয়সা নিয়ে তাদের ঢুকতে দিয়েছিল। পরে কালুডোম তার ভুল বুঝতে পেরে যুদ্ধ করতে শুরু করল। সেই যুদ্ধে কালুডোম ও তার স্ত্রী লখাই মারা গেল। রানী কলিঙ্গাও মারা গেলেন।

শেষ পর্যন্ত রানী কানাড়া তাঁর সহচরীদের নিয়ে যুদ্ধ করতে শুরু করলেন। লাউসেনের অনুপস্থিতিতে যাদের হাতে রাজপুরী রক্ষার ভার দেওয়া হয়েছিল, তারা সকলেই ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। তাই রানী কানাড়া নিজহাতে অস্ত্র ধারণ করেছেন। রানী কানাড়ার শক্তিমত্তার পরিচয় ও বিক্রম দেখে শত্রুপক্ষ রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করলেন।

এদিকে লাউসেন গৌড়ে ফিরে রাজার কাছে পশ্চিমে সূর্যোদয়ের কথা বললেন। লাউসেন মাতুল মহামদের চক্রান্তে রাজা প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না। পরে অবশ্য উপযুক্ত প্রমাণ পেয়ে তিনি লাউসেনের কথা বিশ্বাস করলেন। লাউসেন তাঁর অসাধ্য-সাধনের পরিচয় দিয়ে পিতামাতার বন্দীদশা ঘুচিয়ে সকলকে নিয়ে ময়না-গড়ের পথে চললেন।

লাউসেন দেশে ফিরে এসে দেখলেন কালুডোম, লখাই, রানী কলিঙ্গা প্রভৃতি যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। এদের মৃত্যুর কথা শুনে লাউসেন মনে খুব কষ্ট পেলেন। তাঁর একান্ত আপনজন সকলেই মৃত্যু বরণ করেছেন—সুতরাং তাঁরও বেঁচে থেকে কি লাভ! মনের দুঃখে তিনি ধর্মঠাকুরের স্তব করতে সুরু করলেন। ধর্মঠাকুর লাউসেনের স্তবে তুষ্ট হ'য়ে তাঁর অনুপস্থিতির সময়, যাঁরা যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করেছিলেন, তাঁদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিলেন।

লাউসেনের মামা মহামদ এতদিন ধরে কেবলই লাউসেনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ক'রে এসেছেন। মহাপাপী মহামদ। তাঁর পাপের শাস্তির জন্য ধর্মঠাকুর তার সর্বাঙ্গে কুষ্ঠব্যাধি দিলেন। কুষ্ঠব্যাধির যন্ত্রণায় কাতর হয়ে মাতুল মহামদ এবার লাউসেনের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। মাতুলের প্রতি দয়াপরবশ হ'য়ে লাউসেন ধর্মঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করে মাতুলকে রোগমুক্ত করে দিলেন।

লাউসেন এবার নিরুপদ্রবে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। যথাকালে পুত্রের উপর রাজ্যশাসনের ভার দিয়ে তিনি সশরীরে স্বর্গে গেলেন।

ধর্মের মাহাত্ম্য কথা শুনে সর্বজন।
ধর্মপূজায় লাউসেন আনন্দিত মন॥

———



কলিযুগের অবতার মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ। ভক্ত বৈষ্ণবদের বিশ্বাস—দ্বাপরযুগের রাধা ও কৃষ্ণ একদেহে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যই কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে জন্ম নিয়েছিলেন। ধন্য এই কলিযুগ—মহাপ্রভুর হরিনাম সঙ্কীর্তন-প্রচার আর আদ্বিজ-চণ্ডালে তাঁর প্রেমদান ধন্য।

নবদ্বীপের পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র নিত্য পরম ভক্তিভরে বিষ্ণুপূজা করেন। ভক্তের ব্যাকুল ডাকে তাই ভগবান তাঁর সন্তানরূপে নেমে এলো তাঁর ঘর আলো ক'রে।

১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের আঠারই ফেব্রুয়ারি ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শচীদেবীর গর্ভে জন্ম নিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। সেদিন দোল-পূর্ণিমা আর চন্দ্র-গ্রহণ যোগ। চন্দ্র-গ্রহণের সময় যখন নবদ্বীপের অসংখ্য মানুষ গঙ্গার ঘাটে ঘাটে স্নানরত আর হরিধ্বনিতে সমস্ত নবদ্বীপ মুখরিত, ঠিক এমন সময়েই মহাপ্রভুর জন্ম। ইনি জগন্নাথ মিশ্রের কনিষ্ঠ সন্তান।

জগন্নাথ মিশ্রের বড় ছেলের নাম—বিশ্বরূপ। তাঁরই নামের সঙ্গে মিল রেখে জগন্নাথ নবজাতকের নাম রাখলেন বিশ্বম্ভর। তাঁর

ডাক নাম নিমাই। কেহ বলেন, নিম গাছের নীচে জন্ম বলে—নিমাই। আবার কেহ বা বলেন, যমকে এড়াতে এবং তাঁর মুখ তেতো হবে বলে—নিমাই। কেহ বলেন, আট-আটটি কন্যা মারা যাবার পর জন্মেছেন বলে—নিমাই। গায়ের রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিল বলে, কেহ কেহ তাঁকে ডাকতেন গৌরাঙ্গ।

বালক বয়সে নিমাই ছিলেন খুব দুরন্ত। তবু তাঁকে অনেকেই খুব আদরও করতেন। কোন কোন প্রতিবেশী আবার তাঁর দুরন্তপনায় অতিষ্ঠ হ'য়ে জগন্নাথ মিশ্র কিম্বা শচীদেবীর কাছে নালিশ করতেন।

মায়ের বকুনি খেয়েও দুরন্ত নিমাই-এর দুষ্টুমি কিন্তু কমত না। কেহ হয়তো ঠাকুরের জন্য ভোগ রান্না করে রেখেছেন পূজার শেষে উৎসর্গ করার জন্য, টের পেয়ে নিমাই তা আগেই মুখে দিতেন, কেহ হয়তো মাটির শিব তৈরী করে পূজো করছেন, চোখ মিলে তাকিয়ে দেখেন—নিমাই শিব নিয়ে চলে গেছেন। কখনো বা ঢিল ছুঁড়ে ভেঙে দিয়েছেন মেয়েদের কোমরের জলভরা কলসি। এমনি আরও কত রকমের দুরন্তপনা।

অল্প বয়সে নিমাইকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ভর্তি করে দেওয়া হ'ল। মহাপণ্ডিত গঙ্গাদাস তাঁর টোলে নিমাই-এর মত মেধাবী ছাত্র পেয়ে খুব খুশী। কিন্তু নিমাই-এর ভাগ্যে লেখাপড়া বেশীদিন হ'ল না। দাদা বিশ্বরূপ অল্প বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে চলে গিয়েছিলেন বলে, তাঁর বাবা-মা ভাবলেন—এ ছেলেও বেশী লেখাপড়া শিখলে হয়ত সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করবে। পাছে আদরের ধন নিমাই সন্ন্যাসী হয়ে চলে যায়, তাই মা শচীদেবী কিছুতেই তাঁকে আর টোলে পড়তে দিলেন না।

নিমাই-এর দশ বছর বয়সে, বাবা জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যু হ'ল। সংসারের সব রকম দায়িত্ব এসে পড়ল বালক নিমাই-এর ওপর। বাড়ীতে বসে নানা শাস্ত্র পাঠ ও চর্চা করে নিমাই পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন। ষোল বছর বয়সে, তিনি নিজেই টোল খুলে বসলেন।

নিমাই পণ্ডিতি করে খুব নামযশ পেলেন। তাঁর টোলে ভর্তি হয়ে শাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য দলে দলে ছাত্র ভর্তি হ'তে লাগল।

শচীদেবী এবার নিমাইয়ের বিয়ে দেবার জন্য নিমাইকে ধরে বসলেন। মায়ের কথা নিমাইকে রাখতেই হবে। মায়ের খুব আগ্রহে, লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হ'ল। বিয়ের পর আদি পিতৃভূমি শ্রীহট্টে বাবার শিষ্যদের সঙ্গে দেখা করার জন্য নিমাই শ্রীহট্ট গেলেন। দেশের সকলে নিমাই পণ্ডিতকে দেখে খুব খুশী হ'লেন।

শ্রীহট্টে বেশ কিছুদিন কাটবার পর, নিমাই নিজের দেশে ফিরলেন। ফেরার পথে, তিনি শুনলেন নবদ্বীপে তাঁর পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর মৃত্যু হয়েছে। এই কথা শুনে নিমাই পণ্ডিত শোকাহত হলেন। ঘরে ফিরে শুনলেন—মা শচীদেবীর বুক-ফাটা কান্না। নিমাই মাকে সান্ত্বনা দিতে নানা কথা বোঝালেন। মায়ের ভয়—ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে; সংসারের মায়ায় তাঁকে বেঁধে রাখতেই হবে। কিছুদিন পর, মায়ের চোখের জল মুছিয়ে, মায়ের ইচ্ছায় রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা পরমাসুন্দরী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে নিমাই বিবাহ করলেন।

গয়ায় পিতৃশ্রাদ্ধ করতে গিয়ে শ্রীবিষ্ণুর পাদ-পদ্ম দেখে নিমাই মূর্ছিত হ'য়ে পড়লেন। আবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পেলেন—ভগবান বিষ্ণু যেন তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। এই ঘটনার পর ভাবান্তর এল নিমাই-এর মনে। সংসারে আর তিনি ফিরবেন না, সোজা মথুরা-বৃন্দাবনে যেতে চাইলেন। সঙ্গীরা তাঁকে অনেক বুঝিয়ে শেষে নবদ্বীপে ফেরালেন।

নবদ্বীপে ফিরে এসে সব সময় নিমাই যেন আনমনা হ'য়ে থাকেন—অধ্যাপনায় তাঁর আর মন বসে না। সংসারের কোন কিছুতেই মন নেই। নিমাই-এর এ ভাবান্তর দেখে সবাই চিন্তিত। নিমাই এই সময় ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা নিলেন।

দীক্ষা নেবার পরও, নিমাই-এর ঐ একই ভাব। সংসারে মন নেই; কেবল মুখে হরিনাম—কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণনাম বলতে বলতে তাঁর চোখে জল

আসে। হরিনাম ঘরে ঘরে ছড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত, তাঁর মনে শান্তি নেই। তিনি হরিনাম সঙ্কীর্তনের জন্য—অচণ্ডালদের মধ্যে হরিনাম বিতরণের জন্য হরিনামের এক দল গড়ে তুললেন। এই দলে এসে একে একে মিলিত হলেন, অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ, গদাধর, শ্রীবাস, মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তরা। শ্রীবাসের আঙিনায় উচ্চকণ্ঠে সবাই হরিনাম সঙ্কীর্তন আরম্ভ করলেন। নিত্যানন্দের আগ্রহে তিনি পথ পরিক্রমা করে, হরিনাম বিতরণের জন্য নগর-কীর্তনের ব্যবস্থা করলেন। নগরের পথে পথে হরিনামের কীর্তন। নগরের কিছু দুষ্ট লোক কাজীর কাছে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ জানালেন। কাজী নিষেধ করে দিলেন—কেউ যেন নগরে কীর্তন গাইতে না পারেন। নিমাই সঙ্কীর্তন করতে করতে কাজীর কাছে হাজির। নিমাই-এর মুখের দিকে তাকিয়ে কাজী কী রকম যেন হয়ে গেলেন। তিনি ভক্তিভরে প্রণাম করলেন নিমাইকে আর তাঁর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন।

নগর-কীর্তনের পথে আরও কত রকমের বাধা। কীর্তনে পাষণ্ডরা বাধা দিল। আর বাধা দিল জগাই মাধাই নামে দুই ভাই। একদিন জগাই আর মাধাই দুই ভাই পথের উপর মাতলামি করতে করতে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর কপালে আঘাত করল। রক্ত ঝরে পড়ছে কপাল থেকে—তবু গৌর-নিতাই তাদের উপর রাগ করলেন না; হরিনামের মন্ত্র শুনিয়ে তাদের দুই ভাইকে হরিনামে আকৃষ্ট করলেন। এমনি আরও কত পতিতকে গৌর-নিতাই উদ্ধার করলেন। যবন হরিদাসকে নিমাই বুকে তুলে নিলেন। হরিনাম শুনিয়ে তাঁর সঙ্গী করে নিলেন।

এবার সন্ন্যাস গ্রহণের বাসনা তাঁর মনে প্রবলভাবে দেখা দিল। তিনি আর সংসারে থাকবেন না। বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ আর পুরীর জগন্নাথ যেন তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। তাঁরা সকলে মহাপ্রভুর জন্য অপেক্ষা করছেন। মহাপ্রভু আর এ-সংসারের মায়ায় বাঁধা থাকবেন না। এক রাত্রে গৃহত্যাগ করে, তিনি নবদ্বীপের সকলকে কাঁদিয়ে কাটোয়ায় কেশবভারতীর কাছে সন্ন্যাসের দীক্ষা নিলেন। সন্ন্যাসের

পর তাঁর নূতন নাম হ'ল—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য। এই সময় তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ বছর।

সন্ন্যাস নিলে আর ঘরে ফিরতে নেই। মা শচীদেবীর সে কী বুকফাটা কান্না। নিমাই যে মায়ের চোখের মণি—আদরের ধন ; তাঁর সেই নিমাই আজ সংসার ছেড়ে চলে গেল। বিষ্ণুপ্রিয়ারও সে কী কান্না। সে-কান্নায় যেন পাষাণও গলে যায়।

সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর বেশে শ্রীচৈতন্য চললেন নীলাচল অর্থাৎ পুরীধামের পথে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথের বিগ্রহ দর্শন করে চৈতন্য মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হলেন। তাঁর এই অপূর্ব ভাবাবেশ লক্ষ্য করে, পুরীর সভাপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁর নিজের বাড়ীতে এনে বেদান্তের ব্যাখ্যা শুনতে চাইলেন। কিন্তু অল্প সময়ে সার্বভৌম তাঁর নিজের ব্যাখ্যার ভুল বুঝতে পেরে, মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

দু'বছর নীলাচলে অবস্থানের পর মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণে বের হ'লেন। সেতুবন্ধ রামেশ্বর ঘুরে তিনি গোদাবরী-তীরে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে ভক্ত-প্রবর রায় রামানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'ল। রায় রামানন্দের সঙ্গে ভক্তিতত্ত্বের নানা শাস্ত্র আলোচনা করলেন। তাঁর মুখে ভক্তিতত্ত্বের কথা শুনে, রায় রামানন্দ মুগ্ধ হ'য়ে, তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এবার তিনি পাড়ি দিলেন বৃন্দাবনের পথে।

পথে রামকেলিতে দেখা হ'ল গৌড়ের রাজা হুসেন শাহের দুই মন্ত্রীর সঙ্গে। এঁরা দু'জনেই মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন—তাঁদের নূতন নাম হ'ল শ্রীরূপ গোস্বামী আর সনাতন গোস্বামী। কাশীর বৈদান্তিক সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী বেদান্তের তর্কবিচার করতে এসে শেষ পর্যন্ত দীক্ষা নিলেন শ্রীচৈতন্যের কাছে। এমনি আরও কত মানুষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শরণ নিলেন। নীলাচলে ফিরে তিনি ভক্তদের নিয়ে রাতদিন কেবল কৃষ্ণনামে বিভোর হয়ে থাকেন।

জীবনের শেষে নীলাচল ছেড়ে মহাপ্রভু আর কোথাও যাননি। প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় নবদ্বীপের অগণিত ভক্ত ও বৃন্দাবনের গোস্বামীরা তাঁকে দর্শন করতে নীলাচলে যেতেন।

রথের আগে আগে মহাপ্রভুর ভাবাবেশে নৃত্য-গীত দেখে সকলেই বিমোহিত হতেন। এই সময়ে তিনি সারাক্ষণ ভগবৎ-মহিমায় আবিষ্ট হয়ে থাকতেন।

দিনের পর দিন তাঁর জীবন কৃষ্ণপ্রেমে উদ্বেল হয়ে উঠতে লাগল। এ সময়, তাঁর প্রায়ই বাহ্যজ্ঞান থাকত না। কৃষ্ণের জন্য তাঁর কী আকুল আবেগ। কৃষ্ণ মনে করে কখনো তমাল গাছকে আলিঙ্গন করতেন; কখনো আকাশের কালো মেঘ দেখলে কৃষ্ণ মনে করে, তিনি আত্মহারা হতেন; কখনো বা কদম্ববৃক্ষ দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। আবার কখনো যমুনা বলে ভুল করে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতেন।

কৃষ্ণপ্রেমের ব্যাকুলতায় রাধিকার গৌর-অঙ্গ-কান্তি নিয়ে তিনি কৃষ্ণপ্রেমের পরাকাষ্ঠার পরিচয় দিতে মর্ত্যে এসেছেন। তাঁর মন পড়ে রয়েছে বৃন্দাবন-ধামে, কিন্তু দেহ তাঁর নীলাচলে থেকেও তিনি দেহ ও মনে বৃন্দাবনের রসমাধুরী আস্বাদন করতেন।

সমুদ্রের জলকে কৃষ্ণ মনে করে তিনি একবার সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারপর আর তিনি উঠে আসেননি। কেহ বলেন—তাঁর দেহ জগন্নাথ বিগ্রহের মধ্যে লীন হয়ে গেছে। ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আষাঢ় মাসে মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে মহাপ্রভু লীলা সংবরণ করেন। তিরোধানের পরও তাঁর লীলা চলেছে। এই লীলায় ধন্য হয়েছেন ভাগ্যবান বৈষ্ণব ভক্তকুল।

ধন্য কলিযুগ মহাপ্রভু অবতার।
যাঁহা হৈতে প্রেমধর্ম হইল প্রচার॥

———

দেরে গ্রামের মানিকরাম চাটুজ্যের বড় ছেলে ক্ষুদিরাম। তিনি তাঁর গৃহদেবতা রঘুবীরের পূজো করেন আর নিজের বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করেন। মন তাঁর পড়ে থাকে গৃহদেবতা রঘুবীরের পূজা-অর্চনায়—বিষয়-সম্পত্তির দিকে কিন্তু তাঁর তত মন নেই।



এক সময় দেরে গ্রামের জমিদার রামানন্দ রায় ক্ষুদিরামকে তাঁর পক্ষে আদালতে মিথ্যা সাক্ষী দিতে ডেকে পাঠালেন।

ক্ষুদিরাম এতে রাজী হলেন না। রাগে জমিদার তখন তাঁরই বিরুদ্ধে এক মিথ্যে মামলা রুজু করলেন। ফলে, ক্ষুদিরামকে সর্বস্বান্ত হ'তে হয়। অবশেষে ঐ মিথ্যে মামলায় যথাসর্বস্ব খুইয়ে ছেলেমেয়েদের হাত ধরে ক্ষুদিরাম পথে এসে দাঁড়ালেন।

একমাত্র রঘুবীরকে ভরসা করে, তাঁরা হুগলী জেলার কামারপুকুরে এলেন।

কামারপুকুরই তাঁদের স্থায়ী বাসস্থান হল।

একবার ক্ষুদিরাম গয়ায় যান। সেখানে এক রাত্রে তিনি এক বিচিত্র আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন—যেন গদাধর তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন মনোহর বেশে—আর বলছেন, 'তোমার পুত্র হ'য়ে তোমার বাড়িতে জন্মাব, সেবা নেব তোমার হাতে।' তিনি বাড়ী ফিরে সকলকে সে-কথা বললেন। এদিকে ক্ষুদিরামের পত্নী চন্দ্রমণি একদিন বাড়ীর সামনে যুগীদের শিবমন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন—মহাদেবের গা থেকে একটা জ্যোতি বেরিয়ে এসে ঘুরতে ঘুরতে তাঁকে

ছেয়ে ফেলল। পরে তা তাঁর শরীরে মিশে গেল। চন্দ্রমণি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

সব কথাই শুনলেন ক্ষুদিরাম। তিনি মনে মনে ভাবলেন, তাঁর ঘরে গদাধরের আবির্ভাব হবার আর দেরী নেই।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই ফেব্রুয়ারি চন্দ্রমণির কোল আলো করে এলেন স্বয়ং ভগবান। ক্ষুদিরাম বললেন—গয়াতে তিনি গদাধরের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ছেলের নাম রাখা হোক গদাধর। আদরের নাম—গদাই।

গদাই ক্রমে বড় হতে থাকেন। লাহাবাবুদের নাটমন্দিরে পাঠশালা। তখন পাঁচ বছরের ছেলে গদাধর। তিনি পাততাড়ি বগলে পাঠশালায় যান। সকাল-বিকাল দু'বেলা পাঠশালায় যেতে তাঁর ভালোই লাগে; কিন্তু অঙ্ক কষা তাঁর মোটেই ভাল লাগে না। গুরুমশাই-এর কাছে গল্প শুনতে ভাল লাগে; ধরে বেঁধে পড়াতে গেলে, তাঁর পড়তে মন চায় না।

গদাধর সাত পেরিয়ে আটে পড়েছেন। এবার পৈতে দিতে হবে। তাঁর গোঁ—ধনী কামারনীর কাছে তিনি ভিক্ষে নেবেন। পৈতের সময় ভিক্ষে নিতে হয়। সবাই অনেক করে বোঝালেন—বামুনের ছেলে কামারনীর কাছে ভিক্ষে নেবে কী করে? কিন্তু গদাধরের গোঁ—সবাইকে সে-কথা মানতেই হ'ল।

একবার কামারপুকুরে যাত্রা হবে। যাত্রায় শিব সাজবার কেউ নেই। তখন সবাই দেখিয়ে দিল গদাধরকে। কি সুন্দর মানিয়েছে গদাইকে শিবের বেশে। কি সুন্দর গলায় শিব আসরে গান গাইছেন। কিন্তু শেষরক্ষা আর হল না। শিবের ভূমিকা করতে করতে গদাধর অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

রামায়ণ-মহাভারতের কথা, ধ্রুব-প্রহ্লাদের গল্প মুখে মুখে শুনিয়ে দেন, কিন্তু লেখাপড়ায় তাঁর মন নেই। গুরুজনরা এতে রেগে উঠলেন; গদাধর তাঁদের শুনিয়ে দিলেন—'ও সব চাল-কলা বাঁধা বিদ্যে তিনি শিখবেন না!'

সেই থেকে তাঁকে বাড়ীতে কুলদেবতা রঘুবীরের পূজো করতে দেওয়া হ'ল। গদাধর সুন্দর গান গাইতে পারতেন—তিনি অতিশয় সুকণ্ঠী; ভাল পুতুল তৈরী করতেও পারেন। মাঝে মাঝে গদাই রঘুবীরের নাম করে হাততালি দিয়ে নাচেন—সে নাচ আর থামতে চায় না।

গদাধরের প্রায়ই ভাবসমাধি হয়। শিবের গাজনে অথবা পাঁচালী গানের আসরে আর হরিবাসরে হরিলুটের সময় গদাধর কেমন যেন উন্মনা হ'য়ে যান। চোখ দু'টি নিস্পন্দ, মুখে বিমল হাসি। অথচ বাহ্য জ্ঞান রহিত। আত্মীয়রা সবাই ভাবলেন, ছেলের বায়ুরোগ হয়েছে।

গ্রামে গদাধরের কিছু হচ্ছে না দেখে, দাদা রামকুমার তাঁকে নিয়ে কলকাতায় এলেন। কিছুদিন নাথের বাগানে, কিছুদিন ঝামাপুকুরে গোবিন্দ চাটুজ্যের বাড়ীতে তাঁকে পূজোর নানা কাজ করতে হ'ত। তিনি ঝামাপুকুরে মিত্রদের বাড়ীতেও কিছুদিন বিগ্রহসেবা করেছেন। শুধু মন্ত্র পড়ে পূজো ক'রতে গদাধরের মন চায় না।

দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমনির প্রতিষ্ঠিত ভবতারিণী মন্দিরে প্রথম পূজারী হয়ে এলেন রামকুমার চাটুজ্যে। রানী রাসমনি জাতে কৈবর্ত ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে সব ব্রাহ্মণ পূজো করতে রাজী হননি। শেষ পর্যন্ত রাসমনির জামাই মথুরবাবু রামকুমারকে ঠিক করলেন। এই সূত্রে গদাধরকে মাঝে মাঝে কালীবাড়ীতে আসতে হ'ত। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দিন রামকুমারের কি আনন্দ! কিছুদিন পরে গদাধরও পূজারীর কাজ পেয়ে বরাবরের মত দক্ষিণেশ্বরে চলে এলেন। প্রথমে রাধাকান্তের মন্দিরের পূজারী—তারপর দাদা রামকুমারের জায়গায় হলেন ভবতারিণী মন্দিরের পূজারী। তাঁকে মথুরবাবুর বড় পছন্দ; তাঁর গান শুনতেও মথুরবাবুর খুব আনন্দ। কয়েকদিন পূজো করবার পর, তাঁর মনের অবস্থা আর এক রকম হয়ে গেল। সদা-সর্বদা আপন মনে গান করেন আর প্রতিমার কাছে বসে থাকেন। আপন মনে প্রতিমা সাজান। সর্বদা কেমন যেন উদাস ভাব! সকলে ভাবল—গদাই পাগল হ'য়ে গেছেন।

গদাই-এর এই ভাব দেখে আত্মীয়-স্বজন পরামর্শ দিলেন তাঁর বিবাহ দিতে। বিবাহ করলে মন যদি সংসারে বসে—এই আশায়। কামারপুকুর থেকে দুই ক্রোশ দূরে জয়রামবাটি গ্রামের রামচন্দ্র মুখুজ্যের কন্যা সারদামণির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হ'ল। সিংহবাহিনীর পূজো করে রামচন্দ্র মুখুজ্যে আর শ্যামাসুন্দরী পেয়েছেন তাঁদের কোল আলোকরা কন্যা, সারদাকে।

গদাধর নিজেই বলে দিলেন—আমার বিবাহের পাত্রী জয়রামবাটী গ্রামের রাম মুখুজ্যের বাড়ীতে আছে। তখন গদাধরের বয়স মাত্র তেইশ বছর ; আর সারদার বয়স ছ' বছর!

বিবাহের পর গদাধর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন—আবার কাজে মন দিতে চাইলেন। কিন্তু পূর্বের মতই তাঁর অবস্থা। ভবতারিণীর পূজো করতে করতে কি সব অদ্ভুত স্বর্গীয় রূপ গদাধর দেখতে পান। আরতি করেন—কিন্তু আরতি আর শেষ হয় না। পূজো করতে বসে হয়তো কখনো নিজের মাথায় ফুল দিয়ে বসেন। পূজোর পর মা ভবতারিণীকে খাওয়ানোর জন্য কি যে ব্যাকুলতা। মাকে খেতেই হবে ; নইলে মায়ের হাতের খড়্গ দিয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করবেন। অগত্যা পাষাণী প্রতিমাকে তাঁর কথা শুনতেই হ'ল—গদাধর মা ভবতারিণীর দেখা পেলেন।

গদাধর আপন-ভাবে আপনি পাগল ; অন্য লোক তা কেমন করে বুঝবেন! একদিন মন্দিরে গিয়ে গদাই মা ভবতারিণীকে জিজ্ঞেস করে বসলেন, সবাই আমায় পাগল ভাবে, মা আমি কি সত্যি তাই! অমন যে ভোলা মহেশ্বর—তাঁকেও তো পাগল বলে!

এসব ঘটনায় সবাই ভাবলেন, সত্যিই গদাধর পাগল হয়েছেন। কথাটা রাসমনির জামাই মথুরামোহনের কানে গেল। তিনি গদাধরকে নিজে নানাভাবে পরীক্ষা ক'রে শেষে বুঝলেন, গদাধর সাক্ষাৎ মহাপুরুষ। মথুরামোহন মন্দিরে পূজোর জন্য অন্য ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করলেন এবং গদাধরের দেখাশুনার ভার অপরের উপর দিলেন। মথুরামোহনের নির্দেশে এখন থেকে সবাই তাঁকে 'ঠাকুর' বলে ডাকে।

দক্ষিণেশ্বরে এই সময় ভৈরবী ব্রাহ্মণী, তোতাপুরী, বৈষ্ণব পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ প্রভৃতি সাধক-সাধিকার আবির্ভাব হতে লাগল। ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে দিয়ে নানাভাবে সাধনা করালেন ; তোতাপুরীও ঠাকুরকে দিয়ে সাধনা করালেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও বৈষ্ণবচরণ দুজনেই দেখলেন, ঠাকুরের মহাভাবের অবস্থা। তোতাপুরীও দেখলেন, ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধি। পঞ্চবটীমূলে সাধন-কুটীরে তোতাপুরী মন্ত্র পাঠ করে ঠাকুরকে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষার শেষে তিনি শিষ্যের নূতন নামকরণ করলেন—রামকৃষ্ণ। মথুরবাবুর এই নামটি খুব পছন্দ। সেই থেকে সকলের কাছে তাঁর পরিচয় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

সকলেই বোঝেন, ঠাকুর উন্মাদ হলেও প্রেমোন্মাদ—ঈশ্বরের জন্য পাগল। ঈশ্বর-প্রেরিত না হলে মানুষের এমনটি আর হয় না। এ সময়ে ঠাকুর বৈষ্ণব, শাক্ত, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্মের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে বুঝলেন, যত মত—তত পথ ; লক্ষ্য কিন্তু এক। একদিন পত্নী সারদামণিকে ঠাকুর সাক্ষাৎ ভগবতী জ্ঞানে পূজা করলেন। তিনি বললেন, সারদা মহামায়ারই অংশ, জীবের কল্যাণে মানবের বেশে তিনি এসেছেন।

মহাভাবের সময় ঠাকুর কেবল মা মা করে কাঁদতেন—ভবতারিণীর সঙ্গে কথা বলতেন। মায়ের কাছে উপদেশ নিতেন। তিনি বলতেন—'মা, আমি কেবল তোরই কথা শুনবো ; আমি শাস্ত্র জানি না ; তুই বোঝাবি—তবে বিশ্বাস করব।' তাঁর বিশ্বাস—যিনিই পরমব্রহ্ম, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—তিনিই পরমাশক্তি মা ভবতারিণী। জীবের মঙ্গল করার জন্য ঠাকুরের সে কি ব্যাকুলতা।

ঠাকুরের ডাকে নরেন্দ্র, রাখাল, শরৎ, বাবুরাম, কালী প্রভৃতি ব্যক্তিরা তাঁর কাছে এলেন দক্ষিণেশ্বরে ; নরেন্দ্রই পরবর্তীকালের বিশ্বজয়ী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। ঠাকুরের কাছে এলেন বলরাম বসু, রামচন্দ্র দত্ত, কেশব সেন, গিরিশচন্দ্র, মাষ্টারমশাই প্রমুখ সে-যুগের বহু বিখ্যাত

ভক্তবৃন্দ। ঠাকুরকে অবতার-জ্ঞানে এঁরা পূজো করলেন। ঠাকুর নিজেও বললেন, 'যেই রাম যেই কৃষ্ণ, ইদানীং সে-ই রামকৃষ্ণ।'

নরেন্দ্র প্রণাম-মন্ত্র রচনা করলেন—

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

ভক্তরা যখন ঠাকুরের কাছে আসেন, তখন তাঁর উন্মাদ-দশা কেটে গেছে। তখন তাঁর শান্ত সদানন্দ বালকের অবস্থা। কিন্তু প্রায় সর্বদা সমাধিস্থ; কখনো জড়সমাধি, কখনো বা ভাবসমাধি। যেন শিশুর স্বভাব, সর্বদাই মাতৃনাম—মাতৃমহিমার কথা।

ঠাকুরের প্রায় আটচল্লিশ বছর বয়সে, তাঁর গলায় কর্কটরোগের সূচনা হ'ল। অনেক চিকিৎসা ক'রেও রোগের উপশম হ'ল না। তিনি বুঝলেন, তাঁর লীলাকাল শেষ হ'তে চলেছে। এ সময় একবার কল্পতরু হ'য়ে ঠাকুর সকলকে আশীর্বাদ করলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র একান্ন বছর বয়সে মাতৃনাম জপ করতে করতে, তিনি ইহলোক ছেড়ে চলে গেলেন।

পরবর্তীকালে তাঁর সন্ন্যাসী-শিষ্যরা বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠা করেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ প্রচার করেছেন সারা বিশ্বে। বেলুড় মঠ আজ পুণ্যতীর্থ।

নমো নরদেব, নমো ভবভয়হারী।
নমো নারায়ণ, রামকৃষ্ণ রূপধারী॥

———

পরিশিষ্ট

(অনুশীলনী)

এক। দস্যু রত্নাকর

প্রশ্ন :—(১) রত্নাকর কে ছিলেন ? তাঁর নাম দস্যু রত্নাকর কেন ?
(২) ব্রহ্মা ও নারদের সঙ্গে রত্নাকরের সাক্ষাতের বিবরণ দাও।
(৩) রত্নাকরের মনে ধিক্কার এল কেন ? সে তখন কি করল ?
(৪) দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি হ'ল কিরূপে ?
(৫) রামায়ণ-রচনার বিবরণ দাও।

দুই। ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন

প্রশ্ন :—(১) সগর রাজার অশ্বমেধ-যজ্ঞের আয়োজন কিভাবে হ'য়েছিল ?
(২) দেবরাজ ইন্দ্র তাতে কিভাবে বাধা দিয়েছিলেন ?
(৩) সগর রাজার পুত্ররা কি অন্যায় করেছিলেন ?
(৪) তাঁদের কি পরিণতি হ'ল ?
(৫) ভগীরথ কে ? তিনি কিভাবে মর্ত্যে গঙ্গা আনলেন, তার বিবরণ দাও।
(৬) গঙ্গার অপর নাম জাহ্নবী কেন ? মর্ত্যে গঙ্গার আসবার পথে কি কি বাধা সৃষ্টি হ'য়েছিল ?

তিন। ভক্ত প্রহ্লাদ

প্রশ্ন :—(১) হিরণ্যকশিপুকে ব্রহ্মা কি বর দিয়েছিলেন ? দেবতাদের প্রার্থনায় বিষ্ণু কি আশ্বাস দিলেন ?
(২) প্রহ্লাদ কে ? প্রহ্লাদের শিক্ষার কি ব্যবস্থা হয়েছিল ?
(৩) দৈত্যরা প্রহ্লাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ ক'রেছিল ?

চার। দানবীর রাজা হরিশ্চন্দ্র

প্রশ্ন :—(১) মহারাজা হরিশচন্দ্রের কোন বংশে জন্ম হয় ?
(২) মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের পরিচয় দাও।
(৩) হরিশ্চন্দ্রকে কেন রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হ'ল ?

(৪) হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে শ্মশানে শৈব্যার সাক্ষাৎ কিভাবে হ'ল ? তাঁরা দুজনে দুজনকে চিনতে পেরে কি করলেন ?
(৫) হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা কিভাবে পুনরায় রাজ্য ফিরে পেলেন ?

পাঁচ। সতী সাবিত্রী

প্রশ্ন :—(১) সাবিত্রী কে ছিলেন ?
(২) তাঁর পতির পরিচয় কি ?
(৩) সত্যবানের মৃত্যু হ'ল কিভাবে ? যমরাজের সঙ্গে সাবিত্রীর কথোপকথনের পূর্ণ বিবরণ দাও।
(৪) সাবিত্রীকে সতী সাধ্বী বলা হয় কেন ?

ছয়। ধ্রুবের তপস্যা

প্রশ্ন :—(১) ধ্রুব কে ?
(২) ধ্রুব কেন বনে গিয়েছিল ?
(৩) ধ্রুবের তপস্যার বিবরণ দাও।
(৪) শ্রীহরি ধ্রুবকে দেখা দিয়ে তাকে কি বললেন ?
(৫) পিতামাতার সঙ্গে ধ্রুবের মিলন হ'ল কিভাবে ?

সাত। নল দময়ন্তী

প্রশ্ন :—(১) নল ও দময়ন্তীর পরিচয় দাও।
(২) তাঁরা দুজনে দুজনের মনের কথা জানিয়েছিলেন কিভাবে ?
(৩) স্বয়ম্বর সভায় নল ও দময়ন্তীর দেখা হ'ল কিভাবে ? কলি নলের উপর রুষ্ট হলেন কেন ?
(৪) কলির রাগে নল ও দময়ন্তীর কি অবস্থা হ'ল ?
(৫) নল ও দময়ন্তীর পুনর্মিলন হ'ল কিভাবে ?

আট। রামের অশ্বমেধ ও রামায়ণ গান

প্রশ্ন :—(১) রামচন্দ্র সীতাদেবীকে বনবাসে কোথায় পাঠালেন ?
(২) কেন তাঁকে বনে পাঠানো হ'ল ?
(৩) রামচন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞের বিবরণ দাও।
(৪) লব ও কুশের সঙ্গে রামচন্দ্রের যুদ্ধের বিবরণ দাও।
(৫) বাল্মীকি কিভাবে সকলকে বাঁচিয়ে দিলেন ?

নয়। সীতার পাতাল প্রবেশ

প্রশ্ন :—(১) রামায়ণ গান শুনে রামচন্দ্র কি করলেন ?
(২) সীতার অগ্নি-পরীক্ষা ও পাতাল প্রবেশের বিবরণ দাও।

দশ। উপমন্যুর পরীক্ষা

প্রশ্ন :—(১) উপমন্যুর উপর কি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ?
(২) উপমন্যু সেই দায়িত্ব কিভাবে পালন করেছিলেন ?
(৩) উপমন্যু কিভাবে কূপে পড়লেন ?
(৪) উপমন্যুর মুখে সব কথা শুনে ঋষি কি বললেন ?
(৫) তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল কিভাবে ?

এগার। একলব্যের গুরুদক্ষিণা

প্রশ্ন :—(১) একলব্য কে ?
(২) কেন তিনি দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষা নিতে পারেননি ?
(৩) একালব্যের অস্ত্রশিক্ষার পূর্ণ বিবরণ দাও।
(৪) একলব্য কিভাবে গুরুদক্ষিণা দিলেন, তার বিবরণ দাও।
(৫) গুরুভক্তি একাগ্রতা শিষ্যের লক্ষণ—এ কথার অর্থ কি ?

বার। বেহুলা ও লক্ষীন্দর

প্রশ্ন :—(১) মনসা কে ?
(২) শিব মনসাকে কি বললেন ?
(৩) চাঁদ ও মনসার বিবাদের ফলে কি ঘটল ?
(৪) লক্ষীন্দর কে ?
(৫) তাঁর মৃত্যু হ'ল কিভাবে ?
(৬) বেহুলা কিভাবে তাঁর স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনলেন, তার বিবরণ দাও।

তের। লঙ্কাপুরীর জন্ম

প্রশ্ন :—(১) দুই ভাইয়ের মধ্যে কলহ হয়েছিল কেন ?
(২) পরস্পরের অভিশাপে তারা কি হ'ল ?
(৩) গরুড়ের সঙ্গে পবনের ঝগড়া হয়েছিল কেন ?
(৪) এই ঝগড়ার ফল কি হ'ল ?
(৫) লঙ্কাপুরীর বর্ণনা দাও।

চৌদ্দ। কালকেতু ও ফুল্লরা

প্রশ্ন :—(১) নীলাম্বর কেন মর্ত্যে জন্মালেন ?
(২) দেবী চণ্ডী কালকেতুকে কিভাবে দেখা দিলেন ?
(৩) ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুর সঙ্গে কিরূপ আচরণ করেছিল ?
(৪) শেষ পর্যন্ত কালকেতু কিভাবে তার রাজ্য ফিরে পেল ?

পনের। লাউসেনের গল্প

প্রশ্ন :—(১) লাউসেন গৌড়ে গিয়েছিলেন কেন ?
(২) পথে কি কি বাধা পড়েছিল ?
(৩) কিভাবে সেই বাধা অতিক্রান্ত হ'ল ?
(৪) কানাড়ার সঙ্গে লাউসেনের বিবাহ হ'ল কিভাবে ?
(৫) মহামদ কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন ?
(৬) ধর্মঠাকুর তাঁকে শাস্তি দিয়েছিলেন কিভাবে ?

ষোল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য

প্রশ্ন :—(১) নিমাই-এর অপর নাম কি ছিল ?
(২) বালক বয়সে নিমাই কিরূপ দুষ্ট প্রকৃতির ছিলেন, তার পরিচয় দাও।
(৩) নিমাই-এর জীবনে পরিবর্তন হ'ল কিভাবে ?
(৪) নীলাচলে মহাপ্রভুর জীবনের ঘটনা আলোচনা কর।

সতের। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রশ্ন :—(১) গদাধরের বাল্যকালের ঘটনা আলোচনা কর।
(২) গদাধরের অন্য নাম কি ?
(৩) গদাধরকে সবাই পাগল ভেবেছিল কেন ?
(৪) মথুরামোহন তাঁর সঙ্গে কিরূপ আচরণ করলেন ?
(৫) ঠাকুরের প্রধান প্রধান ভক্তের নাম কি ?
(৬) নরেন্দ্রনাথ কি প্রণাম-মন্ত্র রচনা করলেন ?
(৭) এ মন্ত্রের তাৎপর্য কি ?
